পরিপূর্ণ দ্বীনদারির জন্য মু'আশারাতের আদব রক্ষা করা অপরিহার্য

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقال النبي ﷺ: انما العبرة بالخواتيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসার ফায়দা

আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া আমাদের আয়ত্তাধীন নয়, তবে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা আমাদের হাতে। আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা হলো খানকায় যাওয়া, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসা।

আল্লাহ তা'আলা একেকজনের ভেতরে একেক ধরণের গুণ রেখেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة

'মানুষ খনিতুল্য স্বর্ণ-রূপার খনির মতো।' (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬৩৮)

মাটির নিচে যেমন স্বর্ণ-রূপার খনি থাকে, মানুষের অন্তরেও তেমনি আল্লাহর মহব্বত, মা'রেফত, তাওয়াযু (বিনয়), ইখলাস ইত্যাদির খনি থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরকে আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টি করেছেন। ভালো মানুষের সোহবতে-সংশ্রবে থাকলে অন্তর তার ভালো ভালো গুণাবলি টেনে নিতে থাকে, আবার খারাপ মানুষের সোহবতে থাকলে তারও খারাপ বিষয়গুলোও অন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে খারাপ মানুষের বৈঠকে গেলে অন্তর তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন গুনাহ ভালো লাগতে থাকে; আবার কোনো মানুষ যত খারাপই হোক, আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে গেলে তার অন্তরে গুনাহের আগ্রহ ও প্রেরণা দুর্বল হতে থাকে এবং ভালো কাজের আগ্রহ বাড়ে, শক্তিশালী হতে থাকে।

আল্লাহর আশেকরা আল্লাহওয়ালাদের খানকায় একসাথে বসেন। এ সময় তাদের অন্তর থেকে ভালো ভালো বিষয়গুলো অন্যদের অন্তরে চুম্বকের আকর্ষণের মতো প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে একই মুহূর্তে মজলিসের প্রত্যেকের দ্বারা অন্যদের ফায়দা হতে থাকে এবং প্রত্যেকেই ফায়দা পেতে থাকে। ধীরেধীরে সবার অন্তর কল্যাণকর বিষয় ও গুণাবলি দিয়ে পূর্ণ হতে থাকে এবং খারাপ বিষয়গুলো দূর হতে থাকে। এর তুলনা অনেকটা মোমবাতির আলোর মতো; সবাই আলো নিলেও তার আলোতে কোনো ঘাটতি হয় না।

জামাআতের সাথে নামায আদায় করারও একটা হেকমত বা ফায়দা এটা যে, অন্যদের ভালো বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে আসে, আবার আমাদের ভালো বিষয়গুলো অন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে। আল্লাহওয়ালাদের যে কোনো দ্বীনি জমায়েত থেকেই এমন ফায়দা পাওয়া যায়। এজন্য এসব দ্বীনি মজলিসের মূল্যায়ন করা দরকার। অবশ্যই যে কোনো একজন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখতে হবে, কিন্তু ফায়দা নেওয়া যাবে হাক্কানি সিলসিলার যে কোনো বুযুর্গ থেকে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত খানকাহকে, দ্বীনি মজলিসগুলোকে কেয়ামত পর্যন্ত আবাদ রাখেন। আমীন।

খানকাহ আবাদ রাখার সহীহ তরীকা

এদেশে ইসলাম এসেছে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের মাধ্যমে। তারা কেউ বাগদাদ থেকে, কেউ শাম (সিরিয়া) থেকে, কেউ ইরাক থেকে, আবার কেউ ইয়েমেন থেকে এসেছেন। এভাবে একেকজন একেক জায়গা থেকে এসেছেন। আল্লাহ যাকে যখন যেখানে যাওয়ার কথা ইলহাম করেছেন, সাথে সাথে তিনি সে জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন, কীভাবে যাবেন– কোনো কিছুই তারা জানতেন না। একটা জায়গার ব্যাপারে তাদের অন্তরে ইলহাম হতো; ব্যস, তারা সেই জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন।

আমাদের দেশেও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণ এভাবে ইলহামের মাধ্যমে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। এ দেশে এসে তারা সাধারণত মানুষের হেদায়াতের জন্য সবার আগে খানকাহ বানাতেন। প্রথমে একটা দিঘী খনন করতেন, এরপর দিঘীর মাটি দিয়ে একটা মসজিদ এবং তার সাথে খানকাহ নির্মাণ করতেন। আবার শুধু খানকাহও নির্মাণ করতেন। সেই খানকাহের মধ্যে তা'লীম চলত। অর্থাৎ সে যুগে আলাদা মাদরাসা ছিল না; বরং খানকাহগুলোই মাদরাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

পরবর্তীকালে আমাদের দেওবন্দের আকাবিরগণ দেখলেন, যে বুযুর্গকে কেন্দ্র করে খানকাহ গড়ে ওঠে তার ইন্তেকাল হয়ে গেলে সে খানকাহ সামলানোর মতো যোগ্য লোক পাওয়া যায় না, ফলে খানকাহটি অনাবাদ পড়ে থাকে।

এ অবস্থা লক্ষ করে আমাদের আকাবিরগণ খানকাহর পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেন। তাঁরা খানকাহের মধ্যে মাদরাসা করার পরিবর্তে মাদরাসার মধ্যে খানকাহ বানানো শুরু করেন। ফলে কোনো খানকা'র বুযুর্গের ইন্তেকাল হয়ে গেলেও সে মাদরাসায় তালিম-তরবিয়তের ধারা অব্যাহত থাকে। আর মাদরাসার উসিলায় খানকায় স্থায়ীভাবে দ্বীনের কাজও চলতে থাকে। তবে খানকাহকে মাদরাসা বানানো হোক বা মাদরাসাকে খানকাহ বানানো হোক, কাজ একই।

আমাদের শায়খ হারদুয়ীর হযরত রহ.-ও খানকাহের সাথে মাদরাসা চালু রেখেছেন। হযরতের ইন্তেকালের পর আল্লাহর রহমতে আমি দু'বার হারদুয়ী গিয়েছি। তাঁর খলীফাগণও সেখানে হুবহু তাঁর তরীকায় সেই নমুনায় কাজ করে যাচ্ছেন।

দ্বীনদার-পরহেযগার হতে হলে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' (সূরা তাওবা; আয়াত ১১৯) এটা তাযকিয়ার মূল কথা। আমাদের প্রত্যেকের তিনটি মেহনত করতে হবে- দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়া।

দাওয়াত এবং তা'লীম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত; একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যায় না। দাওয়াতের মধ্যে তা'লীম চলে আসে, আবার তা'লীমের মধ্যেও দাওয়াত চলে আসে। সহজে বোঝাতে উভয়টার জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা'লীম মুসলমানদের জন্য এবং তাবলীগ সবার জন্য। আর এগুলো আল্লাহর দরবারে কবুল করানোর জন্য প্রয়োজন ইখলাস, যা আসবে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি দ্বারা। কাজেই মৌলিকভাবে এই তিনটি মেহনত জরুরি। আমাদের প্রত্যেকের হিসেব মেলানো উচিত যে,

আমাদের এই তিনটি মেহনত হচ্ছে কিনা। আমি মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি কিনা, তা'লীম করছি কিনা, আত্মশুদ্ধি করছি কিনা।

হযরত উমর ফারুক রাযি. বলতেন,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হিসেব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসেব নাও।' কাজেই এ তিনটি মৌলিক মেহনতের প্রত্যেকটির সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা আছে কিনা, সে হিসেব নিতে হবে। সম্পর্ক না থাকলে শুরু করতে হবে। প্রত্যেকটির জন্য কিছু না কিছু সময় অবশ্যই দিতে হবে।

মু'আশারাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

দ্বীন হলো পাঁচটি জিনিসের সমষ্টি। ঈমান, ইবাদাত, মু'আমালাত- মু'আশারাত, আখলাকিয়্যাত এবং দাওয়াত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মু'আশারাত ঠিক করা।

আলোচনার শুরুতে আমি মু'আশারাত সম্পর্কে একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। মু'আশারাতের সারকথা হলো, আমি মানুষের কাছে পাওনা থাকতে পারি, মানুষের যেন আমার কাছে পাওনা না থাকে। মানুষের কাছে নিজের পাওনা নিয়ে আমার মাথাব্যথা না থাকুক, আমার কাছে মানুষের পাওনা নিয়ে যেন মাথাব্যথা থাকে। মানুষের কাছে পাওনা থাকলে আল্লাহ সময়মত সেটা উসুল করে দেবেন। কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে, আমার কাছে যেন কারো এক পয়সাও পাওনা না থাকে।

মু'আশারাতের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগে কয়েকদিন মসজিদে যেতে পারেননি; সেসময় হযরত আবু বকর রাযি. নামায পড়িয়েছেন। হঠাৎ একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যান। নামাযের পর তিনি এলান করেন যে, আমি আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছি। আমার কাছে তোমাদের যার যা পাওনা আছে তা এখনই উসুল করে নাও, আমি যেন আল্লাহর কাছে লজ্জিত না হই। তখন এক সাহাবী রাযি. বললেন, হুযূর! আপনি একদিন আমাকে আমার ভুলের কারণে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন, আমি তাতে কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি এটার বদলা নিতে চাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, তুমি বদলা নাও। সে বলল, আমি সেদিন খালি গায়ে ছিলাম, বদলা তো সমান সমান হতে হবে! তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীর থেকে চাদর খুলে ফেললেন। সেই সাহাবী তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালি পিঠে চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন, হুযূর! বদলা হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর মোবারকে চুমু খাওয়ার জন্য সাহাবী এই কৌশল করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেছেন,

كانوا أفضل هذه الأمة، أعمقهم علما وأقلهم تكلفا

অর্থাৎ 'এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা সমগ্র মুসলিমজাতির মধ্যে সবচেয়ে গভীর ইলমের অধিকারী, আর তাদের তাকাল্লুফ বা লৌকিকতা সবার চেয়ে অনেক কম।'

মোটকথা, মু'আশারাতের ব্যাপারে স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত পেরেশান ছিলেন যে, তীব্র অসুস্থতা সত্ত্বেও মসজিদে সবার সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের পাওনা পরিশোধ করতে চেয়েছেন।

মু'আশারাতের ব্যাপারে থানবী রহ. এর কঠোরতা

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, লোকেরা আমাকে মুজাদ্দিদ বলে। আমি দ্বীনের সব বিষয়ের মুজাদ্দিদ কিনা, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন; তবে আমি মু'আশারাতের মুজাদ্দিদ অবশ্যই। মু'আশারাতের ব্যাপারে তিনি নিজেও খুব সতর্ক থাকতেন এবং অন্যদেরও নিয়মিত সতর্ক করতেন।

থানবী রহ. এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি উভয় স্ত্রীর মাঝে খুব সতর্কতার সাথে আশ্চর্যজনক ইনসাফ করতেন। একবার থানবী রহ. কে কেউ দুটি তরমুজ হাদিয়া দেয়। আমাদের কেউ এভাবে হাদিয়া দিলে কী করতাম? একটা তরমুজ এক স্ত্রীর ঘরে পাঠাতাম আর আরেকটা অপরজনকে দিতাম। কিন্তু থানবী রহ. ইনসাফ রক্ষা করার জন্য তরমুজ দুটো মধ্যখান থেকে সমানভাবে কাটলেন, এরপর প্রত্যেক তরমুজের অর্ধেক অর্ধেক উভয় ঘরে পাঠালেন। যদি তরমুজগুলো ভাগ না করে আস্ত তরমুজ একেকজনকে দিয়ে দিতেন তাহলে দেখা যেত, একজনের তরমুজ বেশি মিষ্টি বা সুস্বাদু হয়েছে আর অপরজনেরটা কম মিষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক তরমুজ ভাগ করে দেওয়ার কারণে দুজনই সমান স্বাদের ভাগ পেলেন।

একবার থানবী রহ. এর কাছে তাঁর একজন খলীফা দেখা করতে এলেন নিজের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি ট্রেনে করে এসেছিলেন। থানবী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের টিকিট কেটেছিলে? খলীফা উত্তর দিলেন, হাফটিকিট কেটেছি। থানবী রহ. ছেলের বয়স জিজ্ঞেস করলেন। খলীফা জানালেন, ছেলের বয়স তেরো বছর। তখনকার সময়ে ট্রেনের নিয়ম ছিল, বাচ্চাদের বয়স বারো বছর বা তার বেশি হলে ফুল টিকিট কাটতে হতো। থানবী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের বয়স তেরো হওয়া সত্ত্বেও হাফটিকিট কেটেছ কেন? খলীফা বললেন, হুযূর! ছেলেটা দেখতে ছোট হওয়ায় আট বছরের বাচ্চার মতো লাগে; বয়স অনুযায়ী তেমন বাড়েনি, এজন্য হাফটিকিট কেটেছি। তখন থানবী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ ব্যাখ্যা রেলওয়ের বইয়ে কোথাও দেখেছ? এ ব্যাখ্যা তুমি কোথায় পেলে যে, শরীর না বাড়লে ফুলটিকিট করা লাগে না? থানবী রহ. ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, তাকে খুব ধমকালেন এবং বললেন, তুমি এভাবে যে সামান্য কিছু টাকা বাঁচালে, এটা হারাম কাজ করেছ। এখন এ টাকা ভক্ষণ করলে হারাম ভক্ষণ করা হবে। এরপর থানবী রহ. তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল যে, তুমি তাসাওউফ ও তাযকিয়া বুঝেছ। আজ তোমার এ কাজ দেখে বুঝলাম, তোমার গায়ে এখনো তাসাওউফের বাতাসও লাগেনি ('তুম কো তাসাওউফ কি হাওয়া ভি নেহিঁ লাগি')। তিনি আরও বললেন, আমি তো গায়েব জানি না, ভালো ধারণার ভিত্তিতে তোমাকে যোগ্য মনে করে খেলাফত দিয়েছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা প্রমাণ করে দিলো যে, আমার সে ধারণা ভুল ছিল; মূলত তুমি খেলাফতের উপযুক্ত নও। এরপর তিনি ঐ খলীফার খেলাফত বাতিল করে দেন।

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর এক মুরীদ ছিল নিরক্ষর। সে লেখাপড়া জানত না। থানবী রহ. এর কাছে কোনো হালাত বা অবস্থা জানাতে হলে মৌখিকভাবেই জিজ্ঞেস করে নিত। একদিন থানবী রহ. এর এক খলীফা তার কাছে শুনলেন যে, সে লেখাপড়া না জানার কারণে থানবী রহ. এর কাছে চিঠিপত্র লিখতে পারে না। তখন খলীফা সেই মুরীদকে প্রস্তাব দিলেন যে, তুমি হালাত বলো, আমি লিখে দিই। খলীফার প্রস্তাবে সে মুরীদ তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিল এবং থানবী রহ. এর কাছে জমা দিল। থানবী রহ. জানতেন

যে, এই মুরীদ চিঠিপত্র লিখতে পারে না। তিনি মুরীদের চিঠি দেখে তাকে ডাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে এ চিঠি লিখেছ? তখন মুরীদ সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। এরপর থানবী রহ. সেই খলীফাকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমাকে আমার মুরীদের খবরগীরি করার দায়িত্ব কে দিয়েছে? তুমি কার কাছ থেকে আমার মুরীদকে ইসলাহ করার দায়িত্ব পেয়েছ? এরপর থানবী রহ. খেয়ানতের কারণে তার খেলাফত কেটে দেন।

থানবী রহ. এর সতর্কতা ও বিচক্ষণতার এরকম অনেক ঘটনা আছে। মু'আশারাতের ব্যাপারে তিনি সবসময় এমন চৌকান্না থাকতেন। মু'আশারাত পরিপন্থী যে কোনো কাজ দেখলে তিনি তৎক্ষণাৎ কঠিন পাকড়াও করতেন।

দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা

আমাদের মু'আশারাত এমন হতে হবে, যেন কারও এক পয়সারও হক আমাদের কাছে পাওনা না থাকে। অথচ এ বিষয়ে আমরা একদম উদাসীন।

দেখা যায়, শুধু আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আরও কয়েকজনকে নিয়ে সে দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে যাই। আমাদের সমাজে এগুলো অনেক বেশি হয়ে থাকে। যে মেজবান সীমিত কয়েকজনের জন্য খাবার রান্না করেছেন তিনি এত মেহমান দেখে কী পরিমাণ পেরেশান হন! তখন তার পরিবারের লোকদের জন্য এবং বাবা-মায়ের জন্য রেখে দেয়া খাবারও দিয়ে দিতে হয়। বিশেষ করে বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে এমন জুলুম বেশি দেখা যায়।

অথচ ইসলামের শিক্ষা কী? আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কোনো এক দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে একজন সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে করতে চলতে লাগলেন। এভাবে চলতে চলতে সে সাহাবী নবীজির সাথে মেজবানের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। মেজবান বের হয়ে আসলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন, আমার এ সাহাবী মেহমান হিসেবে দাওয়াত খেতে আসেনি। সে যে কাজের জন্য এসেছিল তা হয়ে গেছে, এখন চলে যাবে। তবে তুমি তাকে রাখতে চাইলে তোমার ব্যাপার।

মোটকথা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহমান হিসেবে নিজের সাথে কাউকে তো নেনইনি, উপরন্তু রাস্তা থেকে জুটে যাওয়া মেজবানের ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। যতজনকে এবং যাকে যাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে শুধু তারাই যাবে, এর বেশি একজনও যাবে না।

মু'আশারাতের ব্যাপারে হারদুয়ীর হযরত রহ. এর কঠোরতা

একবার হারদুয়ীর হযরত রহ. এর সাথে এক ব্যক্তি কোথাও মেহমান হয়েছিল। সে খাওয়ার সময় মেজবানের কাছে কাঁচামরিচ চাইল। এটা দেখে হারদুয়ীর হযরত রহ. প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তিনি বললেন, যদি দেওয়ার হতো তাহলে তো সেই দিত, তুমি চাইতে গেলে কেন? এখন যদি ঘরে কাঁচামরিচ না থাকে তাহলে সে কত পেরেশান হবে! বেচারা কত পরিশ্রম করে এ মেহমানদারির আয়োজন করেছে, এখন এই সামান্য কাঁচামরিচের কারণে সে ভাববে, তার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে গেছে!

আরেকবারের ঘটনা। হারদুয়ীর হযরত রহ. একটি মজলিসে বসে ছিলেন। সে মজলিসে হযরতসহ মোট দশজন মানুষ ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি দশটা কাবাব এনে রাখলেন। তখন এক ভক্ত সেখান থেকে হারদুয়ীর হযরতের সামনে দুইটা কাবাব দিয়ে দিলেন। হযরত সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করে বললেন, তোমাকে এ অধিকার কে দিয়েছে যে, তুমি আমার পাত্রে দুটি কাবাব দিয়ে দিলে? তুমি কারটা কাকে দিলে? তুমি তো মেহমানদারির মালিক নও, আবার বাড়িওয়ালাও তোমাকে এ দায়িত্ব দেননি। তাহলে তুমি কোন অধিকারে এ কাজ করলে? তুমি কি মানুষ নাকি পশু? (ইনসান হো, ইয়া জানোয়ার!)

হারদুয়ীর হযরত রহ. মু'আশারাতের পরোয়া না করায় লোকটিকে পশুর সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মু'আশারাতের আদব রক্ষা করে না সে দেখতে মানুষের মতো হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে পশুর মতো। এজন্য আদাবুল মু'আশারাতের ব্যাপারে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি।

মেহমান হওয়ার এবং মেহমানদারি করার কিছু আদব

আমাদের আচরণ দেখলে মনে হয় যে, মু'আশারাতের বিষয়ে আমরা একেবারেই উদাসীন। কোথাও বেড়াতে গেলে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, তার কোনো খবর নেই। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকলে সেগুলো খোলা যাবে না; দরকার হলে মেজবানকে বলবে, সে খুলে দেবে। লাইট-ফ্যান চালানোর প্রয়োজন হলে মেজবানই চালিয়ে দেবে। মেহমানের এ অধিকার নেই যে, কোথাও বেড়াতে গিয়ে সে লাইট-ফ্যান চালাবে বা দরজা-জানালা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবে। মেজবানের অনুমতি ছাড়া কাউকে খাবারের কোনো অংশ তুলে দেবে না। আমরা এটাকে ইকরাম মনে করি। অথচ এটা ইকরাম নয়, বরং নাজায়েয কাজ। এ সবগুলো কাজেই অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হয়।

আমাদের দেশের রেওয়াজ হলো, মেহমানকে খাবার পরিবেশন করে দেয়া। এমনকি আমরা মেহমানকে খাওয়ার জন্য চাপাচাপি করি, বা চাপ দিয়ে খাওয়াই। অথচ মেহমানকে চাপাচাপি করে খাওয়ানো তার জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। হতে পারে, কোনো একটি খাবারের প্রতি রুচি না থাকা সত্ত্বেও মেজবানের পীড়াপীড়িতে খাওয়ার কারণে সে সমস্যায় পড়ল, অসুস্থ হয়ে গেল। বরং মেহমানদারির নিয়ম হলো, খাবার সামনে রাখা থাকবে, প্রত্যেকে যার যার মতো নিয়ে নেবে, কেউ কাউকে কিছু তুলে দেবে না। এভাবে মেহমানকে তার রুচির ওপর ছেড়ে দিলে সে স্বাধীনভাবে খাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, সুস্থও থাকবে।

হারদুয়ীতে বিকেলে বিদেশি মেহমানদের চা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। সেখানে চা পরিবেশনের পদ্ধতি ছিল চমৎকার। লিকার, চিনি, দুধ, মসলা– চায়ের সব উপকরণ আলাদা-আলাদাভাবে দেয়া থাকত। কারও পছন্দ রঙ-চা, কারও পছন্দ দুধ-চা– যার যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে নিয়ে নিত। কারও নেয়ার ইচ্ছা হলে নিত, না নিলে পাত্রটা পরবর্তীজনের দিকে এগিয়ে দিত। কেউ কাউকে দিয়ে দিত না, শুধু পাত্রটা সবার মাঝে ঘুরত। অথচ আমরা চায়ের সবকিছু তৈরি করে এরপর পরিবেশন করি। এতে কারও চা কম মিষ্টি হয়, কারও চা বেশি মিষ্টি হয়– কত রকম সমস্যা। এরপর আবার চাপাচাপি তো আছেই। অথচ শরীয়তের পদ্ধতি কত চমৎকার– যার দরকার, যেভাবে দরকার, নিয়ে নাও!

শরীয়ত কত সুন্দর পদ্ধতি দিয়েছে! জনসাধারণ তো দূরের কথা, অধিকাংশ আলেমও এগুলো জানেন না। আমাদেরও জানা ছিল না; হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. না বললে আমরা এগুলো বুঝতাম না।

আমলের ওপর রিযিকের প্রভাব

দ্বীনের অন্যতম মৌলিক ফরয হলো হালাল রিযিক অন্বেষণ করা। রিযিক হালাল হলে অন্তরে নেক-আমলের আগ্রহ

সৃষ্টি হয়, অনেক বড় বড় নেক-আমলও অবলীলায় সম্পন্ন করা যায়। আর হারাম রিযিকের কারণে নেক-আমল থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং গুনাহের আগ্রহ বাড়তে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসুলগণ! আপনারা হালাল খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক-আমল করুন।' (সূরা মুমিনূন; আয়াত ৫১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হালাল খাবার গ্রহণের সাথে সাথে নেক-আমল করতে বলেছেন। এর কারণ এটাই যে, হালাল খাবার নেক-আমলের দিকে ধাবিত করে। হাদীস শরীফেও হালাল খাবারের সাথে নেক-আমলের কথা এসেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

من أكل طيبا، وعمل في سنة، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة

'যে ব্যক্তি হালাল খাবার খাবে, সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং তার অন্যায় আচরণ থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৫২০)

অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ হলো, তার থেকে কেউ ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। বরং সবাই এ স্বীকৃতি দেবে যে, সে পারলে মানুষের উপকার করে, কখনো কারও ক্ষতি করে না। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজেকে এমন অবস্থানে নিয়ে আসা।

আয়-রোজগার হালাল হওয়ার সাথে সাথে সম্পদের ব্যয়ও হালালভাবে হওয়া জরুরি। হাশরের ময়দানে আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ের হিসেবও আলাদাভাবে দিতে হবে। আমার টাকা দিয়ে ছেলে-মেয়ে কোনো হারাম কাজ করলে সেটার কৈফিয়তও আমাকে দিতে হবে, কারণ আমিই তাদের হারাম কাজ করার সুযোগ দিয়েছি।

রিযিকের ফিকিরে দ্বীন যেন গৌণ না হয়ে যায়!

অনেকের সারা জীবনের স্বপ্ন থাকে আমেরিকার নাগরিকত্ব নেওয়া। অথচ এই আমেরিকা বিশ্বজুড়ে দস্যুতা করে বেড়ায়। এ রাষ্ট্রটি সবসময় মানবাধিকারের বুলি আওড়ালেও নিজেরা জালেমদের সমর্থন দিয়ে যায় নির্লজ্জের মতো। আমেরিকা এখনও পর্যন্ত ইসরায়েলের পক্ষেই থেকেছে এবং সর্বদা তাদের সকল জুলুম-অত্যাচারকে বৈধতা ও সমর্থন দিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে একটা জরিপের রিপোর্ট দেখলাম। জরিপের বিষয় ছিল, আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের বংশধরেরা কত পার্সেন্ট খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে আর কত পার্সেন্ট তাদের আগেকার ধর্মে অবিচল থেকেছে। সে জরিপের রিপোর্টে দেখা গেছে, আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণকারী মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম কোনোরকমে নিজেদের মুসলিম পরিচয় ধরে রেখে নামকাওয়াস্তে দ্বীন মেনে চললেও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আর মুসলমান থাকে না। অর্থাৎ যারা উন্নত জীবন যাপনের লোভে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তারা মূলত নিজেদের বংশধরদের বেদ্বীন বানানোর রাস্তা খুলে নিয়েছে।

এজন্য যেখানে দ্বীনী পরিবেশ ভালো, আলেম-উলামা আছেন, মসজিদ-মাদরাসা আছে, সেখানেই কষ্ট করে হলেও পড়ে থাকা উচিত। পার্থিব উন্নতি এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা কম হলেও নিজেদের এবং পরবর্তী বংশধরদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য এমন পরিবেশেই থেকে যাওয়া উচিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে এখনও যতটুকু দ্বীনি পরিবেশ আছে এটা দুনিয়ার আর কোথাও, এমনকি আরবেও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা এখনো আমাদেরকে দ্বীনের দিক দিয়ে আরামে রেখেছেন। এর মূল্যায়ন করা উচিত।

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবি রহ. এর নিকট আমেরিকা গমনেচ্ছু এক ব্যক্তি সে দেশে যাওয়ার পূর্বে দু'আ চাইতে আসে। তিনি আর কী দু'আ করবেন! তিনি লোকটিকে বললেন, আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার খোদার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। এ কথা শুনে লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। লোকটি বলল, হুযূর! আপনার কথা বুঝিনি। তখন শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বললেন, তোমার আমেরিকায় যাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, হিন্দুস্তানের খোদা আর আমেরিকার খোদা ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দুস্তানের খোদা অনেক গরিব, তাই যারা এখানে থাকে তাদের সে খোদা তেমন টাকা-পয়সা দিতে পারে না আর আমেরিকার খোদার অনেক টাকা-পয়সা আছে, তাই যারা সেখানে যায় তাদের সে খোদা অনেক টাকা-পয়সা দিতে পারে। তোমার অবস্থায় মনে হচ্ছে, এটাই তোমার বিশ্বাস। যদি এটা তোমার বিশ্বাস না হতো, যদি তুমি সব জায়গার খোদা একজন বলেই বিশ্বাস করতে, যদি তুমি কিসমত বা ভাগ্য দু জায়গায় দু রকম মনে না করতে তাহলে হিন্দুস্তান ছেড়ে আমেরিকা যেতে চাইতে না।

মোটকথা, হালাল রিযিক উপার্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু রিযিকের ফিকিরে দ্বীনদারির ব্যাপারে অবহেলা করা যাবে না। এজন্য দুনিয়াবি কষ্ট-ক্লেশও বরদাশত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কষ্ট করার জন্যই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

'আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা বালাদ; আয়াত ৪)

আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

অনুলেখক : মাওলানা সা'দ আরাফাত
মুদাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর, ঢাকা

(৩৩ পৃষ্ঠার পর : এনজিওদের ফাঁদে...)

এসব সুবিধা লাভের অপেক্ষায় থাকেন। তাই শীতের শুরুতে এবং রোজা ও কুরবানীর ঈদে এসব অঞ্চলের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞদের মতে, দ্বীনী ভাইদের পক্ষ হতে স্বল্প পরিমাণ ত্রাণের ব্যবস্থা হলেও এসব এলাকায় বেশ সাড়া পড়ে থাকে এবং এনজিওদের প্রভাবে যথেষ্ট ভাটা পড়ে।

ছয়. এনজিও-কর্মীদের কুরআন শেখানো

আমাদের অজান্তে অনেক মুসলিম ভাই-বোন ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছেন। তারা অনেকেই নামায-রোযার প্রতি যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের পরিচয় ও ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ঈমানের অমূল্য সম্পদ খুইয়ে ফেলছেন। এনজিও-কর্মীদেরও অধিকাংশই মুসলিম। তাদের অধিকাংশই অসচেতনতার কারণে এনজিও সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছেন। এ অবস্থায় তাদের থেকে দূরে সরে থাকায় বা তাদের প্রতি বিরূপতা পোষণ করায় আখেরে তাদের বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তাদের সাথে সতর্কতামূলক আন্তরিকতা বজায় রেখে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন শিক্ষা ও শুদ্ধকরণের চেষ্টা করতে হবে। এতে আশা করা যায়, কুরআনে কারীমের উসিলায় অল্প সময়েই তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রবেশ করবে এবং তাদের জন্য দ্বীনের কথা গ্রহণ করা সহজ হবে।

এ পদ্ধতিগুলো আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি, এর মাধ্যমে এনজিও আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যত দ্রুত ফলাফল লাভ হয় এবং সমাজে তাদের প্রভাব কমে আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমানের হেফাযতে সচেতন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বড়দের লেখা

সালানা ইমতিহান পরবর্তী বিরতি : কওমী শিক্ষার্থীদের করণীয়

মুফতী ইবরাহীম হাসান

কওমী মাদরাসাসমূহের ঐতিহ্যগত নিয়ম অনুযায়ী ছাত্ররা সারা বছরই আসাতিযায়ে কেরামের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তাদের সকল কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে হিজরী শা'বান মাসে কওমী মাদরাসাসমূহের বার্ষিক পরীক্ষার বিরতি হয়ে যায়। রমযানের আগে পরে মিলিয়ে এই বিরতিটি প্রায় দু'মাস পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে ছাত্ররা সাধারণত আসাতিযায়ে কেরামের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকার সুযোগ পায় না। এ কারণেই রাবেতা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের জন্য রমযানের বিরতির এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পেশ করার কথা ভেবেছে।

*বিষয়টি নিয়ে রাবেতা প্রতিনিধিগণ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, **হযরতুল আল্লাম মুফতী ইবরাহীম হাসান** সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অডিও রেকর্ড থেকে সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার দাওয়াহ বিভাগের তালিবে ইলম মৌলবী **যুবায়ের বিন আইয়ূব**।*

রাবেতা : কয়েকদিন পরই শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা পরবর্তী বিরতি। পুরো রমাযান ও রমাযানের আগে-পরে মিলিয়ে এই বিরতি অনেক দীর্ঘ। 'রাবেতা' চাচ্ছে এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার ব্যাপারে ছাত্রদের সামনে বড়দের পক্ষ থেকে কিছু দিকনির্দেশনা পেশ করতে। এই উদ্যোগের গুরুত্ব কতটুকু?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : গুরুত্ব তো আছেই। কিন্তু আজকাল কলমের লেখা কাগজেই পড়ে থাকে। আমল করার উদ্যোগ খুব বেশি নেওয়া হয় না। রাবেতার এই উদ্যোগও তখনই স্বার্থক হবে যখন কাগজ কলমের বাইরে একে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে। তা না হলে এ ধরনের দিকনির্দেশনা যতো গুছিয়েই পেশ করা হোক না কেন, তাতে পত্রিকার সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কোনো ফায়দা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তাওফীক দান করুন।

রাবেতা : যেহেতু এই বিরতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কুরআন নাযিলের মাস রমাযান; অতএব কুরআনের হাফেযগণ এই সময়ে কুরআনের পেছনে কিভাবে মেহনত করবেন?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : কওমী মাদরাসার ছাত্রদের বড় অংশটি যেহেতু সারা বছর কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করে; সেজন্য যতই ইচ্ছা থাকুক তিলাওয়াত কম হয়। যার কারণে অনেক হাফেযেরই কিছু কিছু অংশ কাঁচা হয়ে যায়। রমাযানে তারাবীহ পড়ানোর মাধ্যমে হাফেয সাহেবগণ কুরআনে কারীম ইয়াদ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকেন। সুতরাং এ সময়ে স্রেফ তারাবীহ পড়িয়ে দেওয়ার নিয়তে কুরআন তিলাওয়াত করলে হবে না। বরং কুরআনকে মুখস্থ ও ইয়াদ করার নিয়তে তিলাওয়াত করতে হবে। দৈনন্দিনের পঠিত অংশ তারাবীহতে পড়ার পাশাপাশি সম্ভব হলে আউয়াবীনে একবার পড়বে এবং তাহাজ্জুদে একবার খতম করার চেষ্টা করবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ তার যেসব পারা কাঁচা (দুর্বল মুখস্থ) আছে সেগুলোর 'জাবরে নুকসান' (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যাবে।

রাবেতা : যারা হাফেয নয় তারা এ সময়ে কুরআনের পেছনে কিভাবে মেহনত করবে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : গাইরে হাফেযদের জন্য এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা হলো তাদের যদি ফযীলতের সূরাগুলো মুখস্থ না থাকে তাহলে এই মাসে নিয়মিতভাবে 'সাবকান, সাবকান' ফযীলতের সূরাগুলো মুখস্থ করবে। ফযীলতের সূরা মুখস্থ থাকলে তিওয়ালে মুফাস্সাল এর শুরু থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করবে। অতঃপর এসব সূরা দিয়ে তারাবী হয়তো পড়তে পারবে না, কারণ শুধু এতটুকু অংশ দিয়ে তো রমাযানের খতম পরিপূর্ণ হবে না, তবে তারা তাহাজ্জুদ অবশ্যই এগুলো দিয়ে পড়বে।

রাবেতা : আপনাদের ছাত্র জীবনে রমাযানের বিরতি কাটানোর কিছু চিত্র আশা করছি।

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : আমাদের সময়ে আমরা তেমন কোন খাস দিকনির্দেশনা পাইনি। তবে নিজের থেকে তিলাওয়াতে কুরআনের প্রতি খুব বেশি যত্নবান ছিলাম। পাশাপাশি কিছু কিতাবাদি মুতালা'আ করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমাদের যামানায় কিতাবের এত ছড়াছড়ি ছিল না যে, চাইলেই আকাবিরদের জীবনী বা এ জাতীয় কিতাবাদি সহজেই পেয়ে যাবো। সে কারণে এ ধরনের কিতাবাদি তেমন একটা পাইনি। একে তো কিতাবাদির মূল্য ছিল অনেক, আবার আমাদের হাতে টাকা-পয়সাও তেমন ছিল না। চাহিদা মত কিতাবাদি সংগ্রহ করতে পারিনি।

তবে আমাদের বেশির ভাগ সময় কাটতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সেটা হল– আমাদের যামানায় তাকরীর লেখার খুব প্রচলন ছিল। সেজন্য আমরা প্রতিবছরই রমাযানের পর যে জামা'আতে ভর্তি হবো সে জামা'আতের ভালো কোনো ছাত্র থেকে তাকরীরের খাতা সংগ্রহ করে নিতাম। অতঃপর রমাযানে সেটা পুরা নোট করে ফেলতাম। তাতে বিরাট একটা ফায়দা হত, এবং লম্বা একটা সময়ও ভালো কাজে কাটত। এখন আমরা পড়ানোর সময় এসব নোট থেকেই বেশির ভাগ বিষয়ের ইস্তিফাদা (উপকার) গ্রহণ করে থাকি।

রাবেতা : কখনো কি এ সময়ে বিগত বছরের তাকরীর লিখেছেন? না শুধু পরবর্তী বছরেরটাই লিখেছেন?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : পরবর্তী বছরেরটাই লিখেছি। যেমন আগামী বছর কাফিয়া পড়ব, তো এবছর যে ভালো ছাত্র কাফিয়ার তাকরীর লিখেছে তারটা দেখে দেখে আমরা নোট করে নিতাম। বিগত বছরের জন্য কিছু করতে হতো না। কারণ আমরা পড়ার সময় এমনভাবে পড়েছি যে, বিগত বছরের বিষয়ে আর হাত দিতে হয়নি। সামনেরটার জন্য ফিকির করেছি। যেমন আমরা কুতবীর তাকরীর আগে থেকেই লিখেছি। নোট করার পাশাপাশি রমাযান মাসে সামনের বছরের কিছু কিতাবও মুতালাআ করেছি। তবে দরসিয়াতের বাইরে আমরা যেতে পারিনি। কারণ দরসিয়াতের বাইরের তেমন কোন কিতাব আমাদের হাতের নাগালে ছিল না।

রাবেতা : আকাবির ও আসলাফের রমাযান অতিবাহিত করার কোন কোন

দিক আমাদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. প্রমুখ আকাবিরের রমাযান পালন আমাদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। 'আকাবির কা রমাযান' নামে একটি কিতাব আছে। যেখানে বড়দের রমাযান কাটানোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। কিতাবটা খুব সুন্দর এবং উপকারী– মুতালা'আ করা দরকার। থানবী রহ. এর 'মাওয়ায়েজ' এর মধ্যে রমাযান সম্পর্কে আলাদা একটা খণ্ডই আছে। ঐটাও পড়ার মত। অন্যান্য আকাবিরও রমাযান নিয়ে লেখালেখি করেছেন সেগুলোও পড়া যেতে পারে।

রাবেতা : এ দীর্ঘ বিরতির সময়ে বিগত বছরের পঠিত বিষয় এবং পরবর্তী বছরের পঠিতব্য বিষয়ে ছাত্রদের করণীয় কী?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : অবশ্যই করণীয় আছে। বিগত বছরের কিতাবে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে কোন উস্তাদের সাথে মশওয়ারা করে তার সোহবতে থেকে ইস্তেফাদা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। অথবা নিজের এলাকার কোন মুস্তাইদ্দ (যোগ্য) আলেম বা ইমাম সাহেব থেকেও ইস্তেফাদা করতে পারে। আর আগামী বছরের প্রস্তুতির জন্য মুকাদ্দামাতগুলো পড়া যায়। যেমন শরহে বেকায়ার বছর শরহে বেকায়ার মুকাদ্দামা, আগামী বছর হেদায়া পড়বে তো হেদায়ার শুরুতে মুকাদ্দামা আছে সেটা পাঠ করা। এজাতীয় কিছু মাযীদ মুতালাআ করে রাখা আদর্শ ছাত্রদের জন্য সফলতার নিদর্শন। কিতাব পরিচিতিও এখান থেকে হাসিল করা যেতে পারে। লম্বা নেসাব নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তেলাওয়াতের পর বেশি কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য অতটুকুই নেয়া যতটুকু করা সম্ভব হবে।

রাবেতা : বিরতিতে ছাত্ররা আকাবির ও আসলাফের কিতাবাদী ও রিসালা থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে? এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নেসাব কামনা করছি।

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : এ বিষয়ে আমার সর্ব প্রথম মাশওয়ারা হল, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর 'আপবীতি' প্রতিটি ছাত্রের পড়া উচিত। এর পাশাপাশি অন্যান্য আকারিদের জীবনীও পড়বে। যেমন 'তাযকিরাতুর রশীদ', তাকী উসমানী সাহেবের 'তারাশে' এবং 'ইয়াদেঁ' ইত্যাদি গ্রন্থ। ছাত্ররা এসব কিতাব উর্দূতেই পড়বে। বাংলা থেকে নিবে না। এজন্য যারা উর্দূ ভালো পারে তাদের থেকে ইস্তেফাদা করবে। না বুঝলে লুগাত দেখে হল করবে। কিন্তু উর্দূ থেকেই বুঝার চেষ্টা করবে। এতে দু'টি ফায়দা হবে। জীবনীও জানা হবে, উর্দূতেও মাহারাত হবে।

রাবেতা : বিরতির সময় পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররা এলাকার জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনী তা'লীমের প্রচার প্রসারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : প্রথমত ছাত্ররা কাফিয়ার পর যে কোন একবছর নূরানী ট্রেনিং দিবে। তারপর ছাত্ররা আগে ঘরের খবর নিবে। মা-বোনদের কুরআন সহীহ করাবে। কারণ সবার তো আর ঘরে দ্বীনী পরিবেশ থাকে না। তাহারাত, সালাত বা অন্যান্য মাসআলা নিয়ে মুযাকারা করবে। এর পাশাপাশি পিতা-মাতার খিদমতের প্রতিও খেয়াল রাখবে।

এরপর আরেকটা সময় এলাকাবাসীর জন্য নির্ধারণ করবে। এলাকাবাসীর জন্য দুইভাবে মেহনত করবে। (১) প্রত্যেককে মসজিদমুখী করার চেষ্টা করবে। (২) মসজিদমুখী হওয়ার পর সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় কাটাবে। এ সময় কমপক্ষে একঘণ্টা নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা দিবে। এলাকার লোকজন যদি এক ঘণ্টা বসতে কষ্টবোধ করে তাহলে আরো কমাবে, বিশ মিনিট বা পঁচিশ মিনিট পড়াবে। তখন কোর্সটা বিশ দিন না হয়ে চল্লিশ দিন হবে বা দুই বন্ধ মিলিয়ে কোর্সটা পূর্ণ করবে। এভাবে সে কুরআনে পাকের তা'লীম এবং কিছু জরুরী মাসআলা-মাসাইল তাদেরকে শিক্ষা দিবে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফযীলতের মৌসুমে তাদেরকে তার গুরুত্ব ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বয়ান করবে। যেমন শবে বরাতের সময় তাদেরকে শবে বরাতের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বয়ান করবে। রমাযানের সময় রমাযানের ফযীলত নিয়ে বয়ান করবে।

রাবেতা : অনেক ছাত্র এ সময়ে পরবর্তী বছরের ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, তারা সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : তাদের জন্য তো বলা হয় যে, তারা মাদরাসায় অবস্থান করে তাদের যে নির্ধারিত মানহাজ আছে সে অনুযায়ী তাকরার-মুতালাআ করবে। নিযামুল আওকাত তৈরী করবে।

রাবেতা : তাকমীল জামা'আতে ও তাখাসসুসাত থেকে ফারেগ অনেক ছাত্রই আগামী বছর খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন, তাদের জন্য রমাযানে তারবিয়াতুল মুআল্লিমীন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : এটাতো খুবই জরুরী একটি বিষয়। আল্লাহ তা'আলা তো সবাইকে সব বিষয়ে যোগ্যতা দেন না। এজন্য অন্যের অভিজ্ঞতা গ্রহণ অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করে পড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের থেকে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এসব প্রশিক্ষণে মুরব্বীদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সার নির্যাস পাওয়া যায়। এজন্য এ সমস্ত কোর্সে অবশ্যই শরীক থাকার চেষ্টা করবে।

রাবেতা : দীর্ঘ বিরতির এই সময় ছাত্র-উস্তাদের পারস্পারিক যোগাযোগ ও মাশওয়ারার গুরুত্ব কতখানি? এই সময়গুলোতে যোগাযোগের ধরণ কেমন হবে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : যে ছাত্র তার ছাত্র যামানায় উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে নিজের ছাত্র যামানা পার করছে, সে এটার গুরুত্ব অবশ্যই বুঝেছে। সুতরাং যারা মাদরাসার এখনও নিয়মতান্ত্রিক তালিব; তারা বাড়িতে যাওয়ার সময় উস্তাদের কাছ থেকে মাশওয়ারা নিয়েই বাড়িতে যাবে এবং সে মাশওয়ারা অনুযায়ীই চলতে চেষ্টা করবে। তারপর বাড়িতে বা তার অবস্থানস্থলে কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে যোগাযোগ করবে। আর যারা ফারেগ হয়ে গেছে তারাও এখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এজন্য তারাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে উস্তাদের সাথে যোগাযোগ করবে। জীবনের সফলতার জন্য এটা খুবই জরুরী এবং উপকারী।

রাবেতা : অনেক ছাত্রের নাহু-সরফ, হাতের লেখা, ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বলতা থাকে। এসব দুর্বলতা কাটাতে বিরতির এ সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : এ বিষয়টা আগেও বলেছি যে, যে ছাত্রের যে বিষয়ে দুর্বলতা সে ছাত্র সে বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো উস্তাদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে নিজের ঘাটতিগুলো পূরণের চেষ্টা করবে।

রাবেতা : বিরতিতে ঘরে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টার পাশাপাশি নিজের আমল ঠিক রাখার জন্য নামায, তিলাওয়াত, পর্দা, সৎ-সঙ্গ ইত্যাদির গুরুত্ব কতটুকু?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : এর জন্য বিশেষভাবে নিজেকে আগে বা-আমল

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সাতমসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ	কার্যক্রম
২৫ রমাযান	ইফতা বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা ও হাদীস বিভাগে ভর্তিচ্ছু পুরাতন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা।
২৭ রমাযান	তাফসীর, আদব ও দাওয়াহ বিভাগে ভর্তিচ্ছু পুরাতন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা।
৭ শাওয়াল	মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তি ফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি।
৮ শাওয়াল	হিদায়াতুন্নাহব থেকে তাখাস্‌সুস (ইফতা বিভাগ বাদে) পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)।
৯ শাওয়াল	ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)।
১০ শাওয়াল	মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও শর্তাবলী

১. ১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি এবং পাসপোর্ট সাইজ সদ্য তোলা ২ কপি ছবি লাগবে।

২. নতুন ছাত্রদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

ক্র.	জামা‘আত	বিষয়
০১	তাফসীরুল কুরআন বিভাগ	তাফসীরে জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর
০২	উলূমুল হাদীস বিভাগ	সহীহ বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার
০৩	ইফতা বিভাগ	সহীহ বুখারী ১ম, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৪	দাওয়াহ বিভাগ	সহীহ মুসলিম (কিতাবুল ঈমান), আহকামুল কুরআন লিল-জাস্‌সাস ১ম এবং বাংলা, উর্দূ ও আরবীতে সংক্ষিপ্ত রচনা
০৫	আদব বিভাগ	আরবী কাওয়াইদ, ইবারত পাঠ, লেখালেখি ও অনুবাদের যোগ্যতা ও আধুনিক আরবীর সাথে সম্পৃক্তি
০৬	তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)	মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ
০৭	নিহায়ী সানী (মিশকাত)	তাফসীরে জালালাইন (পূর্ণ), হিদায়া ১ম ও ২য়
০৮	নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন)	শরহেবেকায়া (পূর্ণ), নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৯	সানাবী সানী (শরহেবেকায়া)	শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক
১০	সানাবী আউয়াল (শরহেজামী)	কাফিয়া, কুদূরী
১১	উস্তানী সালিস (কাফিয়া)	হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ
১২	উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু)	নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগাঞ্জ
১৩	উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর)	মীযান মুনশাইব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব
১৪	ইবতিদায়ী সানী (মীযান)	তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব
১৫	ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর)	উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য)

বি.দ্র. উল্লিখিত জামা‘আতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীর পরীক্ষা হবে।

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সাতমসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

আত-তাখাস্‌সুস ফিল-ফিক্‌হি ওয়াল-ইফতা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১. আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি ফরম ২৪ রমাযান ১৪৪৩ হিজরীর আগেই সংগ্রহ করতে হবে।

২. শুধুমাত্র জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা'র ফাযেলগণ ফরম সংগ্রহ করবেন।

৩. দাওরায়ে হাদীস/তাকমীল জামা'আতে বিগত ১ম সাময়িক পরীক্ষায় কিংবা পূর্ববর্তী বার্ষিক পরীক্ষায় গড় নম্বর মুমতায থাকতে হবে এবং নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দফতর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৪. লিখিত ও মৌখিক দুই পর্বে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৫ রমাযান সকাল ৯.৩০ মি. থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও মৌখিক পরীক্ষা ২৬ রমাযান সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও বাদ যোহর থেকে আসর পর্যন্ত নেয়া হবে।

৫. সহীহ বুখারী ১ম, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হবে।

৬. লিখিত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ পাবে এবং উভয় পরীক্ষায় গড়ে ন্যূনতম ৬৫ নম্বরে উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম ১৫ জন ভর্তির সুযোগ পাবেন।

৭. ২৭ রমাযান সকাল ১১টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং রমাযানের মধ্যেই যাবতীয় ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

জরুরী জ্ঞাতব্য

১. ১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে কিতাব বিভাগে ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর) জামা'আত থেকে সানাবী আউয়াল (শরহেজামী) জামা'আত পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ মাদরাসার শাখা জামি‘আতুল আবরার রাহমানিয়া, স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭-এ ভর্তি হবে। তাদের ফরম ও রসিদ জামি‘আতুল আবরার রাহমানিয়া'র নামে হবে। তাদের ফরম বিতরণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির কার্যক্রম জামি‘আতুল আবরারে আঞ্জাম দেয়া হবে।

২. সানাবী সানী (শরহেবেকায়া) জামা'আত থেকে তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) জামাআত পর্যন্ত এবং সকল তাখাসসুসের ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদরাসায় ভর্তি হবে। তাদের ফরম ও রসিদ জামি‘আ রাহমানিয়ার নামে হবে এবং তাদের ভর্তির সকল কার্যক্রম জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ভবনে আঞ্জাম দেয়া হবে।

৩. মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগের ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা **জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া** ও **জামি‘আতুল আবরার রাহমানিয়া** এ দু' প্রতিষ্ঠানের যেকোনোটিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। যারা জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় ভর্তিচ্ছু তারা রাহমানিয়ার ফরম ও রসিদ সংগ্রহ করবে এবং তাদের ভর্তি কার্যক্রম রাহমানিয়ার ভবনে আঞ্জাম দেয়া হবে। আর যারা জামি‘আতুল আবরারে ভর্তিচ্ছু তারা জামি‘আতুল আবরারের ফরম ও রসিদ সংগ্রহ করবে এবং তাদের ভর্তি কার্যক্রম জামি‘আতুল আবরারে আঞ্জাম দেয়া হবে।

-জামি‘আ কর্তৃপক্ষ

চলমান তাবলীগের গোড়ার কথা : ইলিয়াস রহ.-এর ফিকির ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-২

মাওলানা সাঈদুর রহমান

আহলে ইলমের প্রতি মনোযোগ

হযরত রহ. নিজ থেকে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, আহলে হক এবং আহলে ইলম যতক্ষণ এই কাজের প্রতি মনোযোগী না হবেন এবং তত্ত্বাবধান না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নবাগত এবং সূক্ষ্ম ও স্পর্ষকাতর কাজের বিষয়ে ইতমিনান হওয়া যায় না।

দরসও তাদরীসের সাথে সম্পৃক্ত কতক ব্যক্তিত্বের সংশয় ছিল যে, তাবলীগ এবং ইসলাহের এই প্রচেষ্টায় মাদরাসার ছাত্র-উস্তাদগণের অংশগ্রহণ তাঁদের ইলমী ব্যস্ততা ও তারাক্কীর জন্য বাঁধা তৈরি করতে পারে। কিন্তু ইলয়াস রহ. যে পদ্ধতিতে উলামা ও তলাবাদের থেকে এই কাজ নিতে চাচ্ছিলেন তা মূলত উলামা-তলাবাদের ইলমের তারাক্কী ও মজবুতির এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা ছিল। এক চিঠিতে হযরত ইলয়াস রহ. লেখেন- 'ইলমের উন্নতি ও অগ্রগতি অনুযায়ী এবং ইলমের উন্নতি ও অগ্রগতির অধীনেই দ্বীনে পাকের উন্নতি ও অগ্রগতি। আমার এই আন্দোলন দ্বারা ইলমের সামান্যতম আঁচ লাগুক এটা আমার জন্য মহাক্ষতি। এই তাবলীগের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ইলমের দিকে উন্নয়নকারীদের বাধা দান বা ক্ষতি করা নয়; বরং ইলমের ক্ষেত্রে আরও অনেক উন্নতি প্রয়োজন এবং বর্তমানে যা উন্নতি হচ্ছে মোটেই যথেষ্ট না।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২৩)

আলী নাদাবী রহ. লিখেন, মাওলানা চাইতেন যে, তলাবারা নিজেদের উস্তাদদের নেগরানীতেই নিজেদের ইলমের হক আদায় করা এবং মাখলুককে তার ফায়দা পৌঁছানোর অনুশীলন করে নিক; যেন তাদের ইলম মাখলুকের জন্য উপকারী হয়। এক চিঠিতে লিখেন, 'কতই না ভাল হতো যে, শেখার সময়কালেই উস্তাদদের নেগরানীতে আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের অনুশীলন হয়ে যেতো! তাহলে ইলম আমাদের জন্য উপকারী হতো! অন্যথায় আফসোস যে, বেকার হয়ে যাচ্ছে! অন্ধকার ও অজ্ঞতার কাজে লাগছে! ইন্নালিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২৪)

যা হোক, হযরত ইলয়াস রহ. নিজের এই দাওয়াতকে উচ্চতর ইলমী ব্যক্তিত্বদের নজরে আনার জন্য দ্বীনী মারকাযগুলোতে জামাআত পাঠানো শুরু করলেন। তিনি মেওয়াতীদেরকে দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর এবং থানাভবনের দিকে পাঠানো শুরু করলেন। তাদেরকে হেদায়াত দিলেন যে, বুযুর্গদের মজলিসে তাবলীগের উল্লেখ করবে না। আশপাশে কাজ করতে থাকবে। হ্যাঁ, যদি হযরতগণের পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় তখন বলবে।

হযরতজী রহ. ইরশাদ করেন, 'আমাদের সাধারণ কাজের সাথীগণ যেখানেই যাবে, সেখানকার হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে এই উপস্থিতি শুধুমাত্র কিছু হাসিল করার নিয়তেই হতে হবে। এবং তাদেরকে সরাসরি এই কাজের দাওয়াত দিবে না। ঐ সমস্ত উলামায়ে কেরাম যারা দ্বীনী কাজে মাশগুল থাকেন তারা তাদের কাজ তো খুব ভালভাবেই জানেন এবং তাদের কাজের ফায়দা ও অভিজ্ঞতা তাদের সামনে রয়েছে। আর তোমরা নিজেদের এই কাজ তাদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারবে না অর্থাৎ তোমরা নিজেদের কথার দ্বারা এই ইয়াক্বিন দিতে পারবে না যে, এই কাজ তাদের অন্যান্য দ্বীনী কাজের মাশগালাহ (ব্যস্ততা) থেকে বেশী কল্যাণকর ও ফায়দাজনক। ফলে ফলাফল এই দাড়াঁবে যে, তারা তোমাদের কথা গ্রহণ করবে না। আর যখন তাদের মুখ দিয়ে একবার 'না' বের হবে, তখন দ্বিতীয়বার তাদের মুখ দিয়ে খুব সহজেই 'হ্যাঁ' বের হবে না। অতঃপর পরিণতি এই হবে যে, তাদের অনুসারী জনসাধারণও তোমাদের কথা শুনবে না। আর এটাও অসম্ভব না যে, স্বয়ং তোমাদের অন্তরেও এই কাজের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই জন্য তাদের খেদমতে শুধুমাত্র কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যেই যেতে হবে। কিন্তু তাদের পরিবেশে খুব মেহনতের সাথে কাজ করতে হবে এবং উসূলসমূহের বেশীর থেকে বেশী পাবন্দি করার চেষ্টা করবে। আশা করা যায় এভাবে তোমাদের কাজ এবং এর ভাল ফলাফলের বিষয় এমনিতেই তাঁদের কানে পৌছে যাবে। আর সেটাই তাদের জন্য দাওয়াত এবং তাদের তাওয়াজ্জুহ অর্জনের মাধ্যম হবে। অতঃপর তাঁরা যদি স্বয়ং তোমাদের দিকে এবং তোমাদের কাজের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হন তাহলে তাঁদের কাছে এই কাজের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দিক-নির্দেশনা দেওয়ার দরখাস্ত করবে এবং তাদের ইযযত সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে আদব ইহতেরামের সাথে নিজেদের কথা তাদেরকে বলবে।' (মালফূযাতে ইলয়াস; পৃষ্ঠা ২৯)

থানাভবনে তাদের কার্যক্রম দেখে হযরত থানবী রহ. এই কাজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যান। ফলে একবার হযরত ইলয়াস রহ. থানবী রহ.-কে এই পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলতে চাইলেন, তখন থানবী রহ. বললেন, দালায়েলের প্রয়োজন নেই। দলীল কোনো জিনিসকে প্রমাণ ও সাব্যস্ত করার জন্য দিতে হয়; আমার ইতমিনান তো বাস্তবতা থেকে হয়ে গেছে। এখন আর কোনো দলীলের প্রয়োজন নেই। আপনি তো মাশাল্লাহ নিরাশাকে আশা দ্বারা বদলে দিয়েছেন। (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২৬)

দাওয়াত ও তাবলীগের মেওয়াতী সাথীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরতজী তাদের হিদায়াত দিয়ে লিখেছেন যে, 'হযরত থানবী রহ. এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের খুব এহতেমাম করা কর্তব্য। যে কোন ভাল কাজ করে তাঁকে সাওয়াব পৌঁছাবে। বেশি বেশি কুরআন খতম করবে। এটা জরুরী না যে সবাই একত্র হয়ে পড়তে হবে। বরং প্রত্যেকে এককভাবে পড়া বেশি উত্তম। তাবলীগে বের হওয়ার সাওয়াব সবচে বেশি। তাই এ পদ্ধতিতে বেশি বেশি সাওয়াব পৌঁছাবে।' (মাকাতিব; পৃষ্ঠা ১৩৭ [মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি])

একই চিঠিতে হজরতজী আরো বলেন, 'হযরত থানবী রহ. থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জরুরী হল, তাঁর মুহাব্বত থাকতে হবে। সে সাথে হযরতের সাথীবর্গ এবং হযরতের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে হবে। তাঁর কিতাবগুলো

অধ্যয়নের মাধ্যমে ইলম আসবে আর তাঁর সহচরদের মাধ্যমে আমল আসবে।' (মাকাতিব; পৃষ্ঠা ১৩৭ [মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি])

একবার হযরতজী ইরশাদ করেন, 'হযরত মাও. থানবী রহ. বহুত বড় কাজ করেছেন, আমার দিল চায় যে, তা'লীম হবে তার তরীকায়, আর তাবলীগ হবে আমার তরীকায়। এভাবে তার তা'লীম ব্যাপক হয়ে যাবে'। (মালফূযাত; মালফূয নম্বর ৫৭)

এক মজলিসে হযরতজী ইরশাদ করেন, 'থানবী রহ. এর মুরিদানের আমার নিকট অনেক কদর ও ইজ্জত রয়েছে। কারণ তিনি আমার সমসাময়িক। যেহেতু আপনারা মাওলানার কথা শুনেছেন, তাই আমার কথা তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেন। আপনাদের কারণে আমার কাজে অনেক বরকত হয়েছে। আমার অন্তর খুশিতে ভরে গেছে। ' তারপর তাদেরকে খুব দু'আ দিলেন এবং বলেন, 'আপনারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কেঁদে কেঁদে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন'। (মালফূয নম্বর ৫৭)

হযরতজীর অনুরোধে ও তাগাদায় বিভিন্ন মাদরাসার উলামায়ে কেরাম ও মুহতামিমগণও দাওয়াত ও তাবলীগের মশওরায় জমায়েত হতেন। সাইয়িদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. বলেন, 'একবার সেখানে মাদরাসাগুলোর (নিজস্ব অবস্থান থেকে) কাজে অংশগ্রহণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ ও মতবিনিময় হল। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তাইয়েব সাহেব, মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী' সাহেব, সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার নাযিম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ই'যায আলী সাহেব ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব এ পরামর্শ সভায় শরীক হয়েছিলেন। মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরীও নিযামুদ্দীনে তাশরীফ আনলেন। ফলে এর নূরানী পরিবেশ দ্বিগুণ ঝলমলে হয়ে উঠল।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২৬, ১২৭)

সাইয়্যেদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেওয়াতী সাথীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরতজী তাদের হিদায়াত দিয়ে লিখেছেন, "নিজেদের কারগুযারী পেশ করার সাথে সাথে হযরত শাইখুল হাদীস (যাকারিয়া রহ.) সাহেবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একথাও লিখবে যে, বিভিন্ন রকম কষ্ট বরদাশত করে তোমাদের ঘর ছেড়ে বের হওয়া শুধুমাত্র আপনার 'তাওয়াজ্জুহের' বরকতে হয়েছে। আমাদের অবহেলার কারণে আপনার যে কষ্ট হয়েছে সে জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ولكن لا تحبون الناصحين (কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না) এর দলভুক্ত হবে না; বরং আপন কল্যাণকামীদের বেশি থেকে বেশি সন্তুষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সাইয়্যেদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. কৃত 'মাকাতিব' হযরত মাওলানা ইলয়াস; পৃষ্ঠা ১৩৭ [মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নম্বর চিঠি])

হযরত নাদাবী রহ. লিখেছেন যে, 'জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর খলীফাবৃন্দ এবং সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য আউলিয়াগণের সাথে হযরতজীর ভক্তি ও মুহাব্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় আকার ধারণ করেছিল। হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে এমন মুহাব্বতপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, অনেক সময় বলতেন, এ সমস্ত বুযুর্গানে কেরামকে আমি আমার অস্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে মনে করি।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ৫৩)

একবার হযরতজী মেওয়াতিদেরকে লক্ষ করে বলেন, 'তোমরা ঐ সমস্ত উলামায়ে কেরামের খেদমত করতে থাক, যারা এখন পর্যন্ত তোমাদের কওমকে দ্বীন শিখানোর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হচ্ছেন না। যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম তোমাদের প্রতি মুতাওয়াজ্জেহ হচ্ছেন না, যদি তোমরা তাদের খেদমত করতে থাক তাহলে তারাও তোমাদের কওমের দ্বীনের খেদমত করতে থাকবেন।' (মালফূযাত; মালফূয নম্বর ১৮৭)

সাইয়িদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. বলেন, '(অশিক্ষিত মেওয়াতীদের মাধ্যমে যখন ইলয়াস রহ. মেহনত শুরু করলেন, তখন) মানুষ এই বলে তাজ্জব প্রকাশ করত যে, ইলমহীন মেওয়াতীরা নিজেরাই তো তাবলীগ ও তরবিয়তের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে আবার কীভাবে এ কাজে লাগানো হচ্ছে? কিন্তু হযরত মাওলানার মতে অন্যের ইসলাহ ও সংশোধন আসলে তাদের বিষয়ই নয়। এক পত্রে তিনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এই মেওয়াতীদেরকে মুসলিহ ও সংশোধনকারী মনে করা উচিত নয়। দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হওয়ার বিষয়টি তো তাদের কাছ থেকে শিখুন। আর সব বিষয় তাদেরকে শিক্ষা দিন। অথচ নিজেদের চিন্তায় তাদেরকে মুসলিহ (ও সংশোধনকারী) ধরে নিয়ে পরে সেই ভিত্তিতে সমালোচনা করা হচ্ছে।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১০৭)

হযরত রহ. ইরশাদ করেন, 'আমাদের এই দ্বীনী দাওয়াতের কাজে মশগুল সমস্ত সাথীদের একথা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ যে, তাবলীগ জামাআতের বের হওয়ার উদ্দেশ্য শুধু অন্যকে পৌঁছানো ও বাতলানো নয়। বরং এর দ্বারা নিজের ইসলাহ এবং তা'লীম ও তরবিয়তও উদ্দেশ্য। সুতরাং বের হওয়ার সময়গুলোতে ইলম ও যিকিরে খুব গুরুত্ব দিয়ে মশগুল হওয়া উচিৎ। ইলমে দ্বীন হাসিল ও যিকির ব্যতীত বের হওয়ার কোন অর্থ হয় না। আবার এটাও জরুরী যে, এই ইলমে দ্বীন এবং যিকিরের মাশগুলিয়াত ঐ পথের বড়দের সাথে সম্পর্ক রেখে, তাদের হেদায়াত ও নেগরানী অনুসারে হতে হবে।'

এরপর হযরত আরো বলেন, 'আম্বিয়া আলাইহিস সালামের ইলম এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত অনুসারে ছিল। আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ইলম ও যিকির হাসিল করতেন, আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের পরিপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। এমনিভাবে প্রত্যেক যুগের সবলোকই নিজেদের বড়দের কাছ থেকে ইলম ও যিকিরের সবক নিতেন এবং তারাও তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে এবং তাদের দিকনির্দেশনায় তা পরিপূর্ণ করতেন। এমনিভাবে আজও আমরা আমাদের বড়দের (উলামায়ে কেরাম ও বুর্যাগানে দ্বীন) মুহতাজ। অন্যথায়- শয়তানের জালে আমাদের ফেঁসে যাওয়ার বড়ই আশংকা রয়েছে।' (মালফূয নম্বর ১৩৪)

সাইয়িদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. বলেন, 'মাওলানা (ইলয়াস রহ.) একদিকে উলামায়ে কেরামকে দাওয়াতের মাধ্যমে আওয়ামের কাছে যাওয়ার এবং আওয়ামের প্রতি দরদী হওয়ার তাগিদ করতেন। অন্যদিকে আওয়ামকে উদ্বুদ্ধ করতেন, যেন তারা উলামায়ে কেরামের কদর ও মর্যাদা বুঝে এবং উসূল ও আদব রক্ষা করে তাঁদের খেদমতে হাজির হয় এবং প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করে। তাদেরকে তিনি উলামায়ে কেরামের

যিয়ারত ও মুলাকাতের সাওয়াব এবং তাঁদের খেদমতে হাজির হওয়ার উসূল-আদব শেখাতেন। উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেওয়ার, তাঁদের থেকে ফায়েদা হাসিল করার এবং তাঁদেরকে কাজে যুক্ত করার হিকমত ও পদ্ধতি বলতেন। উলামায়ে কেরামের কোন কথা বা কাজ বুঝে না এলে এর সুব্যাখ্যা গ্রহণ এবং সুধারণা পোষণের অভ্যাস তাদের মাঝে গড়ে তুলতেন। তাদেরকে তিনি উলামায়ে কেরামের খেদমতে পাঠাতেন এবং ফিরে আসার পর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন যে, কীভাবে গিয়েছ? কী করেছ? কী বলেছ? (ইত্যাদি। অতঃপর প্রয়োজনে) তাদের (আপত্তিকর) সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়ার সংশোধন করতেন। এভাবে ব্যবসায়ী শ্রেণীকেও উলামায়ে কেরামের এত কাছে নিয়ে এসেছিলেন যে, বিগত বহু বছরে (সম্ভবত খেলাফত আন্দোলনের পরে) এমনটি কখনো দেখা যায়নি।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২৩)

হযরত নাদাবী রহ. আরো বলেন, 'কারো প্রতি কোন অভিযোগ উত্থাপন করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। কেউ যদি কাজের প্রতি সাধারণ আলেম সমাজের অনীহা বা অনাগ্রহ সম্পর্কে অভিযোগ করতেন, হযরত মাওলানা বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-কৃষি ইত্যাদি নিছক দুনিয়াদারি ত্যাগ করে এই কাজে আসতে কত ইতস্তত করে থাক, আর উলামায়ে কেরাম যেসব কাজ করেন, সেগুলোও তো দ্বীনের কাজ। তাঁরা তাদের কাজ ছেড়ে এত সহজে চলে আসবেন, এমন আশা কর কেন? তাঁদের প্রতি তোমাদের অভিযোগ কেন?' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১০৩)

হযরত নাদাবী রহ. আরো বলেন, 'উম্মতের যে সকল শ্রেণী বা মহল দ্বীন ও দ্বীনী আখলাক থেকে বহুদূরে সরে গেছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদেরকেও হযরত মাওলানা উপেক্ষা করতে চাইতেন না। এ কারণেই আওয়াম ও উলামায়ে কেরামের অপরিচয় ও দূরত্ব কিছুতেই তাঁর বরদাশত ছিল না। এটাকে তিনি উম্মতের বিরাট দুর্ভাগ্য, ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য বিরাট 'খাতরা' এবং ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার পূর্ব লক্ষণ মনে করতেন। মাওলানা তাঁর দাওয়াতী মেহনতের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। (এবং কিছু সুলক্ষণও ফুটে উঠেছিল) যে, একাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আওয়াম ও উলামায়ে কেরাম পরস্পর কাছাকাছি হতে পারবেন এবং একে অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন।' (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ১২২)

হযরত আলী নাদাবী রহ. লিখেছেন যে, 'আরবী মাদরাসার তালেবে ইলম যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'কারামের' (দানশীলতার) দস্তরখানে মেহমান হন, হযরত ইলয়াস রহ. তাদেরকে 'মেহমানানে নবুওয়াত' বলে উল্লেখ করতেন।' (মাকাতীব; পৃষ্ঠা ১৭)

উলামায়ে কেরামের প্রতি হযরতজীর শ্রদ্ধাবোধ এতটা ছিলো যে, বাহ্যিক সুন্নাতী লেবাসের কারণে কোনো আওয়ামকে 'মৌলবী' বলা হলে এটাকে তিনি 'মৌলবী' শব্দের অবমূল্যায়ন মনে করতেন। সাইয়িদ আবুল হাসান নাদাবী রহ. কে লেখা এক চিঠিতে হযরতজী লিখেন, ... নাসরুল্লাহ খান সাহেব মৌলবী নন; বরং পাটওয়ারী। (গ্রামের হিসাবরক্ষক) পাটওয়ারের কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দেড়-দুই বছর যাবৎ তাবলীগে লেগেছেন। শুধু তাবলীগের বরকতে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন তা-ই তার অর্জন। 'মৌলবী'-সংশ্লিষ্ট শব্দ অনেক সম্মানের সাথে যথাযোগ্য স্থানে ব্যবহার করা উচিৎ। অধম বান্দার ব্যাপারে জনাব যদি মশওয়ারা কবুল করেন, তবে অধমের আন্তরিক কামনা যে, মামুলী ও সাধারণ শব্দের বাইরে কোন অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার শব্দের 'বে-কদরী' ও অবমূল্যায়নের নামান্তর।'

হযরত আলী নাদাবী রহ. এ চিঠির টীকায় লিখেন, "আমার মেওয়াতের প্রথম সফরে সফরসঙ্গী ও রাহবার হিসেবে দুজন ছিলেন। একজন মুনশী নাসরুল্লাহ খান সাহেব, আরেকজন মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব। আমি 'আল ফোরকানের' প্রবন্ধে ('দ্বীনী মারকাযগুলোতে এক সপ্তাহ' শিরোনামে) মুনশী সাহেবকে তার ধর্মীয় জানাশোনা এবং শরীয়তসম্মত বেশভূষার কারণে 'মৌলবী' শব্দে উল্লেখ করেছিলাম। হযরত সেটার সংশোধন করে দিয়েছেন। (মাকাতীব; পৃষ্ঠা ২২)

একদিন ফজর নামাযের পর যখন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সাথীদের নিযামুদ্দীন মসজিদে একটি মজমা হচ্ছিল এবং হযরত মাও. রহ. তখন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন যে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েও উচ্চ আওয়াযে কথা বলতে পারছিলেন না, তখন তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে এক খাস খাদেমকে ডাকালেন এবং তার মাধ্যমে পূরা জামাআতকে এই কথা বলে পাঠালেন যে, আপনাদের এই সমস্ত ঘুরাফেরা (তাবলীগে সময় লাগানো) এবং সমস্ত চেষ্টা মেহনত সব বেকার হয়ে যাবে যদি আপনারা এর সাথে সাথে ইলমে দ্বীন এবং যিকরুল্লাহর পরিপূর্ণ ইহতেমাম না করেন। (যেন এই ইলম ও যিকির দুইটি ডানা যা ব্যতিত আকাশে উড্ডয়ন করা যায় না।) বরং ভীষণ ভয় এবং কঠিন আশংকা রয়েছে যে, যদি এই দুই বিষয়ের ব্যাপারে গাফলতি করেন তাহলে এই চেষ্টা মেহনত ফেৎনার উৎস এবং গোমরাহীর এক নতুন রূপ ধারণ করবে। যদি দ্বীনী বিষয়ে ইলমই না থাকে তাহলে ইসলাম ও ঈমান শুধু রসমী (গতানুগতিক) এবং নামকাওয়াস্তে থাকবে। ... (মালফূয নম্বর ৩৫)

যে জামাআতগুলো সাহারানপুর, দেওবন্দ ইত্যাদি এলাকায় তাবলীগের জন্য যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে একবার তিনি এই হিদায়াত পেশ করেন যে, 'কাফেলা তথা জামাআতের সাথীদের উদ্দেশ্যে এই নসীহত করা থাকবে যে, যদি হাযরাতে উলামায়ে কেরাম এই কাজের দিকে মনোযোগ কম দেন (কিংবা অংশ গ্রহণ না করেন তাদের অন্তরে যেন উলামায়ে কেরামের প্রতি কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে। বরং এটা বোঝা উচিৎ যে, উলামায়ে কেরাম আমাদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মাশগুল আছেন যার ফলে তারা আমাদেরকে সময় দিতে পারছেন না। তারা তো গভীর রজনীতেও ইলমে দ্বীনের খেদমতে মাশগুল থাকেন যখন অন্যরা আরামের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে।' এরপর হযরত বলেন যে, তাদের এই কাজের প্রতি অমনোযোগিতাকে নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি বলেই গণ্য করে নিবে যে আমরা তাদের কাছে আসা যাওয়া কম করেছি বিধায় এমনটি হয়েছে। এই জন্যই তো যারা বছর বছর ধরে তাদের কাছে পড়ে থাকেন তাদের প্রতি আমাদের চেয়ে বেশী মুতাওয়াজ্জেহ হয়ে থাকেন'। অতঃপর তিনি ফরমান, **একজন সাধারণ মুসলমান সম্পর্কেও কোন কারণ ছাড়া বদগুমানী (খারাপ ধারণা পোষণ করা) নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করে। আর উলামায়ে কেরামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন (বদগুমানী করা) তো এর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক ও ভয়ংকর।**

এরপর বলেন, 'আমাদের তাবলীগের এই তরীকায় মুসলমানকে ইজ্জত করা এবং উলামায়ে কেরামকে ইহতিরাম করা বুনিয়াদী এবং মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের কারণে ইজ্জত

করতে হবে। আর উলামায়ে কেরামকে ইলমে দ্বীনের কারণে অত্যন্ত সম্মান করা কর্তব্য'।

এরপর বলেন, 'ইলম এবং যিকিরের কাজ এখনও আমাদের মুবাল্লিগদের আয়ত্তে আসেনি। এটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। **আর এর তরীকা এটাই যে, এই সাথীদেরকে আহলে ইলম এবং আহলে যিকিরগণের নিকট পাঠানো হবে যেন এরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাবলীগও করে এবং তাঁদের ইলম ও সাহচর্য দ্বারা উপকৃতও হয়'**। (মালফূয নম্বর ৫৪)

একবার হযরতজী ইরশাদ ফরমান, 'আহলে দ্বীন (উলামায়ে কেরাম ও বুর্যুগানে দ্বীন) কে এ কাজে (তাবলীগী ও ইসলাহী কাজে) চেষ্টা মুজাহাদা করে অংশীদার করা এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে রাজি করানো এবং (মুতমা'ইন করা) নিশ্চিন্ত ও চিন্তামুক্ত করার জন্য বেশী বেশী চেষ্টা মেহনত করা উচিৎ'। এরপর হযরত বলেন, আর যেখানে তাদের এখতেলাফ ও অপছন্দের কথা জানা যাবে সেখানে তাদেরকে মা'যূর মনে করে তাদের ব্যাপারে ভাল ব্যাখ্যা করা উচিৎ। এবং তাদের খেদমতে দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও উপকৃত হওয়া এবং বরকত হাসিলের জন্য যাওয়া উচিৎ।' (মালফূয নম্বর ৮৮)

মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান মুফতী শফী সাহেব রহ. একবার পুত্র রফী উসমানী কে সঙ্গে নিয়ে কোনো এক কাজে দিল্লীতে গমন করেন। সফরের মাঝে তিনি হযরতজীর সাথে দেখা করতে যান। হযরতজী তখন শারীরিক দুর্বলতা হেতু বিছানায় শায়িত ছিলেন। মুফতী আজমের সাথে উষ্ণ সাক্ষাতের পর কথা প্রসঙ্গে হযরতজী রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের ক্রমোন্নতি এবং ব্যাপকতা প্রসঙ্গে নিজের শঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এ ক্রমোন্নতি আল্লাহর পক্ষ হতে 'ইস্তিদরাজ' কি না?'

হযরত মুফতী আযম তাকে শান্ত্বনা দিলেন যে, 'যদি এটা ইস্তিদরাজ হতো, তবে আপনার অন্তরে এ ভীতি সৃষ্টি হতো না, আপনার অন্তরে এ ভীতি সৃষ্টি হওয়াই প্রমাণ করছে যে, এটা ইস্তিদরাজ নয়; বরং আল্লাহর রহমত।' (ইস্তিদরাজ হলো, আল্লাহ তা'আলা গোনাহগার বান্দাদেরকে ঢিল দেন, অতঃপর যখন সে সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তখন তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করেন। আর এ ঘটনাটি স্বয়ং মুফতী রফী উসমানী সাহেব দা.বা. কয়েক বছর আগে 'মারকাযুশ্ শায়েখ যাকারিয়া, বসুন্ধরা, ঢাকা-এর উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন।)

দাওয়াত ও তাবলীগের ইজতেমাতে আকাবিরে হিন্দের সমর্থন ও উপস্থিতি

৮, ৯, ১০ জিলকদ ১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে 'গোড়গানওয়াঁ' জেলার নূহ অঞ্চলে এক বিরাট তাবলীগী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হল। মজমার সুপ্রশস্ত শামিয়ানার নীচে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. জুম'আর নামায পড়িয়েছিলেন। জলসা ও ইজতিমা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব বলেছেন, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি সব রকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করছি; কিন্তু এমন প্রকৃতির এবং এমন বরকতের ইজতিমা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। [দ্বীনী দাওয়াত : পৃষ্ঠা. ১১৪, ১১৫]

হযরত ইলয়াস রহ. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত শায়েখ সাইয়িদ রাবে' হাসানী নাদাবী রহ. লিখেন, 'তাবলীগের এই কাজে হযরত ইলয়াস রহ. এর সঙ্গ দেন তাঁর আত্মীয় ও শ্যালক মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধলবী রহ.। তিনি তাঁর সাথে দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত হন এমনকি তাঁর ডান হাতে পরিণত হন। তারপর এই দাওয়াতের পন্থা, উসূল ও পদ্ধতি সংকলন করেন। যে ব্যাপারে যুগের বড় আলেমগণ একমত হয়েছেন এবং তাঁদের সাথে দাওয়াতী ইজতিমাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি কয়েকজনের নাম; হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ., মাওলানা যফর আহমাদ থানবী রহ., কারী তৈয়ব সাহেব রহ., মাওলানা আব্দুশ শাকুর ফারুকী রহ., মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. নিজ কলম ও রচনাবলী দ্বারা এই কাজে সহযোগিতা করেন। তিনি ফাজায়েলের কিতাবগুলো রচনা করেন। যা তাবলীগের পূর্ণাঙ্গ নেসাব হিসেবে গণ্য হয়। এমনিভাবে মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধলবী রহ. হযরত ইলয়াস রহ. এর ইঙ্গিতে রচনা করেছেন 'পস্তি কা ওয়াহেদ এলাজ' নামক রিসালা। অতঃপর মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর, নদওয়াতুল উলামা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম এই কাজের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, মাওলানা মনজুর নোমানী রহ., সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ., মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালয়াবী রহ., মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান মক্কী/সাহারানপুরী রহ.। এই সকল আলেমগণ সকল ইজতিমাগুলোতে অংশ নিতেন এবং এ জন্য দূরদূরান্তে সফর করতেন। এই দাওয়াতী কাজের সাথে তাঁদের মজবুত সংযোগ ছিল। হযরত ইলয়াস রহ, তাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের কদর করতেন।' (মাওলানা রাবে' নাদাবী কৃত আশ শাইখ মুহাম্মদ ইলয়াস আল কান্ধলবী; আদদাইয়াতুল মুতাফানি ফী সাবিলিল্লাহি তা'আলা, আল বা'সুল ইসলামী, ৩রা মে, ২০২১ ঈ. অনলাইন)

এই কাজের চিন্তাগত প্রেক্ষাপট

মেওয়াতীদের মধ্যে মেহনতের ক্ষেত্র থেকেই হযরত ইলয়াস রহ. এর এই বিস্তৃত দাওয়াতী চিন্তা এবং উম্মতের ব্যাপক ইসলাহের পন্থা অস্তিত্বে আসে। তবে এই কাজের চিন্তাগত প্রেক্ষাপট বিদ্যমান ছিল।

হযরত আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. লেখেন, হযরত ইলয়াস রহ. এর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী বরং তাঁর যেহেনে ইসলামের ইতিহাসের একটি সারমর্ম ছিল যে, উম্মতে মুসলিমা শতবছর ধরে রাজনৈতিক শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন একটি দীর্ঘকাল ধৈর্য ও সম্বরণের সাথে দাওয়াতের মূলনীতি নিয়ে কাজ করার দরকার। তারপর মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও অনুগত্যের যোগ্যতা, নফসের চাহিদা ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কোনো নিয়ম-কানুনের অধীনে কাজ করার সামর্থ্য তৈরী হবে। রাজনীতির সামান্য পরিমাণের জন্য দাওয়াতের অনেক বেশি পরিমাণ প্রয়োজন। দাওয়াতে যতটা দুর্বলতা থাকবে, এই ক্ষেত্রে যতটা তাড়াহুড়া করা হবে; রাজনীতিতে ততটা ত্রুটি, শিথিলতা ও ঘাটতি থেকে যাবে। হয়তো রাজনীতি অস্তিত্বেই আসবে না, অথবা অস্তিত্বে আসলেও তার দালান ভূমিস্মাৎ হবে।

বাস্তবতাও এটা যে খিলাফাতে রাশেদার শক্তিশালী প্রভাব ও শৃঙ্খলা, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিন্যস্ততা ও নির্দেশ মানার যোগ্যতা ঐ সুদীর্ঘ দাওয়াতের ফলাফল ছিল, যা নবুওয়তের প্রথম বছর থেকে শুরু করে খিলাফাতে রাশেদা পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আর পরবর্তীকালের দুর্বলতা এবং সামষ্টিক পতন ছিল দাওয়াতের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে যা খিলাফতে বনু উমাইয়াহ এবং বনু আব্বাসিয়াহর আমলে সৃষ্টি হয়েছিল। (দ্বীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা ৩০৪)

মাওলানা মনজুর নোমানী রহ. নিজের অনুভূতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'মাওলানা (ইলয়াস রহ.) এর দাওয়াত অনেক গভীর ও উসুলী ছিল, শুধুমাত্র গালাবায়ে হাল (মানসিক বিশেষ অবস্থার প্রভাব) থেকে সৃষ্ট নয়। বরং আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও তাওফীকের সাথে সাথে উসুলে দ্বীনের অনেক গভীর চিন্তা-ভাবনা, কুরআন ও হাদীসের গভীর মুতালাআ ও গবেষণা, দ্বীনের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগতি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের জীবনধারা সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর জানাশোনার উপর এই দাওয়াতের ভিত্তি। তাঁর (ইলয়াস রহ.) এর দাওয়াত কিছু এলোমেলো সম্বন্ধহীন টুকরোর নাম ছিল না; বরং মাওলানা (ইলয়াস রহ.) এর যেহেনে এর সুবিন্যস্ত রূপরেখা ছিল; তবে সেই (রূপরেখা বাস্তবানের জন্য) তিনি ধারাবাহিকতা এবং ক্রমবিন্যাসকে জরুরী মনে করতেন।' (দ্বীনী দাওয়াত; ভুমিকা ৩০)

হযরত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. এই কাজ সম্পর্কে আপন অনুভুতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'এটি মুসলমান মুসলমান থেকে উপকৃত হবার পথ, আহলে দ্বীন ও আহলে ইলম থেকে ফায়দা নেওয়া এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর মাধ্যম। উম্মতের বিভিন্ন তবকার পরস্পর ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার মাধ্যম। এই আন্দোলন দ্বীনের গোড়াকে সজীব করে; যার দ্বারা এর সকল শাখা-প্রশাখা সজীব হয়ে উঠবে। এর দ্বারা ইলম উপকারী হতে শুরু করবে। ইসলাহী ও তা'লীমী সকল প্রচেষ্টার প্রভাব বেড়ে যাবে। মানুষের মাঝে প্রকৃত অন্বেষা এবং হক কবুল করার যোগ্যতা তৈরী হয়ে যাবে। এটা শুধু তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক রূপরেখা নয়; বরং এই উসূলের কাজ এমন জায়গাতে করে দেখা হয়েছে যে ইসলাহী কাজের জন্য ঐ জায়গার চেয়ে অধিক অনুর্বর ভূমি এই হিন্দুস্তানে খুঁজে পাওয়াও সম্ভব না। মেওয়াতে বলা হয় যে, ৩০/৩৫ লক্ষ মুসলমানের বসবাস। তাদের অবস্থা আরব জাহিলিয়্যাতের অবস্থার সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তারা কালিমাটা পর্যন্ত জানত না। নামায সম্পর্কে এতটাই অপরিচিত ছিল যে, কাউকে নামায পড়তে দেখলে তামাশা দেখার জন্য একত্র হয়ে যেত। তাদের নাম হিন্দুয়ানী ছিল। তাদের প্রথা-প্রচলন হিন্দুয়ানী ছিল। শিরক এবং মূর্তিপূজার চল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইলমের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই জাতীর শিক্ষা ও ইসলাহের জন্য এই উসূল ও পন্থা ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং এই এলাকায় এই পন্থায় কাজ শুরু করা হয়েছে। আর তার ফলাফল ছিল এই যে, আজ এই ভূ-অঞ্চলে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেছে। সহীহ ইসলামী যিন্দেগী এবং দ্বীনদারীর দৃষ্টান্ত তৈরী হচ্ছে। যা সাদাসিধে ও চেতনার দিক থেকে প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বীনের জন্য মুজাহাদা, ঘর ছেড়ে বের হওয়া এবং কষ্ট সহ্য করার দিক দিয়ে তারা হিন্দুস্তানের সকল মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এলাকার পরিবেশ এমনভাবে বদলাতে শুরু করল এবং স্বভাবের মধ্যে দ্বীনের এমন যোগ্যতা ও তলব পয়দা হলো যে, এই আন্দোলনের প্রভাবে হাজারো মসজিদ, শত শত মাদরাসা-মকতব এবং বহু আলেম-হাফেয তৈরী হয়ে গেল। এই অন্ধকার এলাকা যা শত শত বছর ধরে ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল দেখতে দেখতে আলোকিত হয়ে গেল। যে জাতি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে ছিনতাই, ডাকাতি আর মন্দ স্বভাবের উপমা ছিল; যাদের ভয়ে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শাসনামলে রাজধানী দিল্লীর দরজা সন্ধ্যার সময়েই বন্ধ করে দেওয়া হত, তারাই হয়ে গেল নিরাপদ, ঈমানদার এবং বিশ্বাসের প্রতিক। তাদের এলাকায় অপরাধ দৃশ্যমানভাবে কমে গেছে। এখন এই দাওয়াত হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশ ও শহরগুলোতে ছড়াচ্ছে, আর সেই প্রভাব ও ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে, যা সহীহ পন্থায় মৌলিক দ্বীনী প্রচেষ্টা এবং এই দাওয়াতের সুদৃঢ় উসূলের স্বাভাবিক ফলাফল। ' (আলী নাদাবী কৃত এক আহাম দ্বীনী তাহরীক কা তা'আরুফ; পৃষ্ঠা ৭-৮)

এই কাজের ফলাফল ও শেষকথা

বর্তমানে তো এই দাওয়াত পুরো বিশ্বের মুসলিম অ-মুসলিম অধিকাংশ রাষ্ট্রে ছড়িয়ে গেছে এবং বিস্ময়কর ফলাফল আমাদের চোখের সামনে হাজির করছে। যার বিবরণী আমরা নিজেদের ভাষায় না দিয়ে আরবের স্বনামধন্য আলেম মদ্বীনা ভার্সিটি ও মসজিদে নববীর সাবেক মুদাররিস শায়েখ আবু বকর জাবের জাযায়েরী রহ.-এর কলমে পেশ করছি। তিনি বলেন, 'এই জামাআতকে আমি জেনেছি উত্তর আফ্রিকা, মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায়। যেমন জেনেছি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানি ও ব্রিটেনে। এই জামাআতের কাজ সম্পর্কে শুনেছি আমেরিকায় ও ভারত উপমহাদেশে এবং এই জামাআতের কাজের প্রভাব দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যে। এই দাওয়াতের প্রভাবগুলোর কিছু এই; ১. খুশুখুযুর সাথে নামায প্রতিষ্ঠা। ২. দ্বীনের প্রতিকগুলোর প্রকাশ তথা নারীদের হিজাব, পুরুষদের দাড়ি লম্বা করা, মাথায় পাগড়ি ইত্যাদি। ৩. কথায়, কাজে ও আকীদায় শিরকী বিষয়সমূহ ও কুসংস্কারকে পরিহার করা। ৪.তাওহীদ ও কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের দাওয়াতকে গ্রহণ করা। কারণ উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে অবস্থানকালে শহর থেকে শহর তারা আমার ওয়াজ ও দরসগুলোকে অনুসরণ করত। এই দাওয়াত সালাফী আকীদা এবং শিরক বিদআত ও গোমরাহীর মোকাবেলার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এটা উত্তর আফ্রিকায়; আর ইউরোপে! সেখানে তাবলীগের ফলাফল খুবই প্রশংসনীয়। এখন সেখানে ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে এবং মুসলিম কর্মরতদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, নামায কায়েম করা হচ্ছে। ইসলামী বেশভূষা; দাড়ি, পাগড়ি, কাপড় ও জামা নজরে আসছে। ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আর বহু খৃস্টানরা ইসলামে প্রবেশ করছে। যারা সংখ্যায় হাজার হাজার। এটা এমন ফলাফল যা অস্ত্র, জিহাদ ও শাহাদাতের ভিত্তিতে ইসলামের বিজয় ছাড়া সম্ভব হবার নয়। এই প্রমাণিত বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে শুধু এই বিষয়ে অজ্ঞ কিংবা ব্যক্তিগত বা দলীয় কারণে অজ্ঞতার ভানকারী। দশককে দশক পার হয়েছে অথচ মুসলমানরা ইউরোপে নিজেদের ইসলাম প্রকাশ করতে পারত না। আমেরিকায় তো আরও দুরের কথা। অধিকাংশ কর্মরত মুসলিমরা ছিল নেশাগ্রস্ত, নামায তরককারী আর বেশভূষা আচার-চরিত্রে ইউরোপীয়দের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। এমনকি বরকতময় ও সমুন্নত হক তাবলীগ জামাআতের মাধ্যমে হাজির হলো। যারা বয়ে আনলেন ইসলামের পথনির্দেশনা; আকীদা, ইবাদত এবং জীবনাচারে। নীরবে, সহজে ও ধীরে। ফলে অস্ত্রের জিহাদ ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম অস্তিত্বে আসল

এমনভাবে যা কল্পনাও করা যেত না; চোখে দেখা তো দূরের কথা। ভারত উপমহাদেশে! ভারত উপমহাদেশে তাবলীগের প্রভাব অন্যান্য জায়গার চেয়ে কম নয়। ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত থাকা, ইসলামের শিক্ষা থেকে বেরিয়ে যাবার পর এবং বিদআত ও কুসংস্কার ও বিভিন্ন শিরকী কাজের আবর্তে হারিয়ে যাবার পর বহু মুসলমান ইসলামের দিকে ফিরেছে। যার আলামত হিসেবে যথেষ্ট যে, বাৎসরিক যে ইজতিমা হয় তাতে লাখ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করে, যাদের শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ততা বিস্ময়কর। তারা এর পর পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় কথা ও কাজে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। আর মধ্যপ্রাচ্যে! তাবলীগ জামাআতের প্রভাব মিসরে, জর্দানে, সিরিয়ায়, লেবাননে, উত্তর ইয়ামানে এবং উপসাগরীয় সকল দেশে সুস্পষ্ট। কত বিভ্রান্ত লোকেরা ঠিক হয়েছে! কত গাফেল উদাসীনের বোধ ফিরেছে! কত আল্লাহ ও দ্বীনবিমুখ লোক তওবা করে ফিরে এসেছে! এ সকল দেশের ইসলাহের কাজ যারা করেন তাদের কাছে এগুলো অস্পষ্ট বলে মনে করি না।' (আবূ বকর জাবের জাযায়েরী কৃত আল-কওলুল বালীগ ফী জামাআতিত তাবলীগ, জিলাউল আযহানের সূত্রে; পৃষ্ঠা ২০-২২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝা ও সহীহ তরীকায় দ্বীনের কাজ করার তাওফীক দান করুন।

(এই লেখার বৃহৎ অংশ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. এর লিখিত হযরত ইলয়াস রহ. আওর উনকি দ্বীনী দাওয়াতের আলোকে প্রস্তুতকৃত। এছাড়া মালফূজাত ও মাকাতিব থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার ফুযালা সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে প্রকাশিত রাহমানি কাফেলার জন্য প্রস্তুতকৃত ইলম, উলামা এবং তলাবা সম্পর্কে দাওয়াতও তাবলীগের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নামক প্রবন্ধ যা তৈরি করার কাজে এই লেখকও শরীক ছিল– থেকে নেওয়া। এছাড়া আরব উলামায়ে কেরামের মতামতের অধিকাংশ জিলাউল আযহান নামক কিতাব থেকে নেওয়া। এর বাইরে অন্যান্য কিছু তথ্যসূত্র আছে যা লেখাতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।)

লেখক : মুদাররিস, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপু, ঢাকা

(২ পৃষ্ঠার পর : সম্পাদকীয়)

খ. শর্টকোর্স চালু করা

বয়স্ক ছাত্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শর্টকোর্সের যৌক্তিকতা থাকতে পারে; কিন্তু মাদরাসা শিক্ষা দিয়েই যাদের শিক্ষাজীবন শুরু, তাদেরকে শর্টকোর্স দিয়ে পঙ্গু আলেম বানানোর কী অর্থ? শর্টকোর্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বাদ দিতে হয় কিংবা নামমাত্র পড়াতে হয়। এতে লাভ কী? জাগতিক শিক্ষা যখন প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে, তখন দ্বীনী শিক্ষা শর্ট ও সংকুচিত কেন হবে? এ শর্টকোর্সের অধিকাংশ প্রবর্তক উর্দূ-ফারসীকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা দিয়ে এ দু'টির উপর কাঁচি চালিয়েছেন। এতে এ ধারার শিক্ষার্থীরা আকাবিরে দেওবন্দের জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাধারা, মাওয়ায়েয ও মালফূযাত থেকে পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মূলত উর্দূ-ফারসী বাদ দিয়ে আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ ভিত্তিক কওমী শিক্ষা হতেই পারে না। এমন শর্টকোর্সে শিক্ষিতরা সাধারণত কোনো কওমী মাদরাসা যেমন কায়েম করে না তেমনি কোনো কওমী মাদরাসায় খেদমত করার যোগ্যও হয় না। এদের শেষ ঠিকানা প্রাইভেট কোনো প্রতিষ্ঠান। আর নিজ নিজ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এরা প্রত্যেকেই নেসাবনামায় নিজ নিজ খেয়াল-খুশি মত যোগ-বিয়োগ করতে থাকে। ফলে নেসাবনামা (পাঠ্যসূচি)-টা তাদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়। বলাবাহুল্য যে, চোখের সমস্যা হলে চোখের যত্ন নিতেই হবে। তাই বলে কান কেটে ফেলা যেমন অযৌক্তিক; আরবী ও বাংলায় দক্ষতা তৈরির অজুহাতে উর্দূ-ফারসীকে বাদ দিয়ে দেওয়াও তেমনি অযৌক্তিক। এ নেসাবের সাথে সংশ্লিষ্টরা আর যাই হোন তাদের জন্য আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শে স্থির হওয়া অবশ্যই মুশকিল হবে। অবুঝ শিশুরা ও অবুঝ অভিভাবকরা অল্প সময়ে আলেম হওয়ার কিংবা আরবী ভাষায় ও মাতৃভাষায় দক্ষতার স্বপ্ন নিয়ে এ শর্টকোর্সের ফাঁদে পড়ে এক রকম আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এখনো যারা এ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি, বিবেক থাকলে অচিরেই উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আশা করি। কিন্তু পানি তখন অনেক দূর গড়িয়ে যাবে। অথচ কওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উর্দূ-ফারসীকে সাথে রেখেও আরবী-বাংলায় দক্ষ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। শর্টকোর্সের উৎপত্তির আগে যে সকল আলেম আরবী-বাংলায়ও পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন তারা সকলেই দেওবন্দী নেসাবের ফসল। সময়ের বিবেচনায় দেওবন্দী নেসাবে কিছু আধুনিক আরবী ও বাংলা সাহিত্য জুড়ে নিলেই হতো। যেমনটা বর্তমানে অধিকাংশ কওমী মাদরাসায় করা হচ্ছেও।

গ. গাইড নির্ভর বোর্ড পরীক্ষা

কওমী মাদরাসাসমূহের আদর্শিক ঐক্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কিন্তু এ ঐক্যের জন্য সম্মিলিত পরীক্ষাবোর্ড গঠন কোনো কোনো জায়গায় যে কত মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে তা বর্তমানে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়। শতকরা একজন পরীক্ষার্থী পাওয়া মুশকিল যে পরীক্ষার জন্য গাইড সংগ্রহ করে না। এক-দু'জন বোর্ড পরীক্ষার্থী পাওয়া যায় না যে, শ্রেণী-শিক্ষকের তাকরীর (পাঠদান) মনোযোগ সহকারে এজন্য লিপিবদ্ধ করে যে, তাকে এ তাকরীর থেকেই পরীক্ষা দিতে হবে। অথচ বোর্ড প্রশ্ন এমন না হলে এতো দ্রুত এমন সর্বনাশা চিত্র দেখতে হতো না।

আর সরকারি স্বীকৃতি তো মরার উপর খাড়ার ঘা। বরং এমন গলার কাঁটা যা গেলাও যায় না, ফেলাও যায় না। এ কাঁটার পরিণতি যে কত নির্মম তা অনুধাবন করতে হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। যে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে আকাবিরে দেওবন্দ কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্বীকৃতির নামে আবার সেই শৃঙ্খলেই পা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা যদি এ ভুল থেকে উত্তোরণের কোনো গায়েবী

ব্যবস্থা না করেন, তাহলে কওমী মাদরাসা শিক্ষার অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে না জানি কত কুরবানী পেশ করতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

ঘ. প্রচলিত মহিলা মাদরাসা

মহিলা-পুরুষ উভয়কে দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এবং মহিলারাও কুরআন-সুন্নাহর আলেমা হতে পারে, এতে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু মহিলাদের পাঠ্যসূচিতে অবশ্যই কিছু ভিন্নতা থাকতে হবে। এবং অনিবার্য কারণে তাদের জন্য বাছাইকৃত শর্ট পাঠ্যসূচিই অধিক প্রযোজ্য। বর্তমানে মহিলা মাদরাসাগুলো সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু মহিলা মাদরাসাগুলোকে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করার কী প্রয়োজন ছিল? বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে একেতো তাদের পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত বোর্ডের অধীনে তাদের পরীক্ষা নিতে গিয়ে নানান জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তৃতীয়ত মেয়েদের বাছাইকৃত পাঠ্যসূচিতে আলেমা হওয়ার প্রক্রিয়ায় পরিণতিতে ছেলেদের পাঠ্যসূচিতে সংক্রমিত হয়। বিষয়গুলো অনুধাবনের জন্য সুস্থ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বুযুর্গদের অনেকের মনে প্রচলিত মহিলা মাদরাসার বিষয়ে এখনো যেখানে এতমিনানটুকু নেই, সেখানে গণহারে এগুলোকে বোর্ডভুক্ত করে একই নিয়মে পরীক্ষা নেওয়া যে কী পরিমাণ অবিবেচনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঙ. কওমী মাদরাসা থেকে আলিয়া বা স্কুল বোর্ডে পরীক্ষাদান

নিত্য-নতুন স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এতে বাধা দেওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু কোনো স্বপ্নকে বাস্তবতায় আনতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আনতে হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রায় সকল কওমী মাদরাসায় এ মর্মে আইন করা আছে যে, কোনো ছাত্র কওমী মাদরাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় আলিয়া মাদরাসার কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি কী? ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, কওমী মাদরাসার যে ছাত্ররা আলিয়ায় পরীক্ষা দেয় তাদের দু-একজন ছাড়া প্রায় সবাই বিপথগামিতার ট্রেনের যাত্রী হয়। কওমী ধারায় তার রুজি-রোজগার জোটে না। বাধ্য হয়ে দ্বীনের খাদেম হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার খাদেম হয়। কিছুদিনের ব্যবধানে সুন্নতী বেশভূষাও খোয়ায়। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তো শুরুতেই দ্বীনী শিক্ষাকে বিদায়ী সালাম জানায়।

যখন আলিয়া পরীক্ষার ব্যাপারেই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এ নিষেধাজ্ঞা; তখন কোনো কওমী শিক্ষার্থীর সরাসরি স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার পরিনতি কী হতে পারে তার অভিজ্ঞতা কি কিছু শিক্ষার্থীকে বিপথগামী করে তারপর অর্জন করতে হবে? ফিতনাপূর্ণ এ সময়ে যখন মাদরাসার চার দেয়ালের অভ্যন্তরেই ছাত্রদের আদব-আখলাক ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হচ্ছে, তখন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বসিয়ে পরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়া আর তাদেরকে স্কুল শিক্ষার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া কতটা ঝুকিপূর্ণ কাজ, বিষয়টি কি গভীরভাবে ভেবে দেখার দাবী রাখে না?

চ. পাঠ্য কিতাবাদির অনুবাদ ও শরাহ প্রণয়ন ও তার ব্যাপক বিপনন

অর্জিত নিজস্ব যোগ্যতা ও শিক্ষকের পাঠদানের উপর নির্ভরশীল পড়াশোনা ছাত্রদের যোগ্যতাকে পূর্ণ করে ও উন্নতি দান করে। শিক্ষামহলে বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত ও পরীক্ষিত। এ কারণে বিজ্ঞ শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্য কিতাবের অনুবাদের বই ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংগ্রহ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকেন। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যারা অনুবাদ ও বাংলা-উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংগ্রহ করে তারা দরসে বসে মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের বিশ্লেষণ শোনে না এবং শিক্ষকের তাকরীর নোট করে না। ঠিকমত তাকরার-মুতালা'আও করে না। কারণ সে মনে করে, তার কাছে তো অনুবাদ ও শরাহ আছেই। মনোযোগ দেওয়া, নোট করা বা তাকরার-মুতালা'আর প্রয়োজন কী? এ মানসিকতা শিক্ষার্থীর জীবনে ধ্বংস ও অধঃপতন বয়ে আনে। যোগ্যতার পূর্ণতার পরিবর্তে শূন্যতা নিয়ে আসে। এটা আজ অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এতদসত্ত্বেও কিছু মানুষ কোন্ স্বার্থের বিবেচনায় পাঠ্য বইয়ের অনুবাদ ও অপ্রয়োজনীয় শরাহ রচনার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। শুনেছি উর্দূ কায়েদা ও ফারসী পেহলীসহ কোনো কিতাবই নাকি অনূদিত হতে বাকি নেই। কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারদের অবদান মোটেও নগণ্য নয়; বরং এদের অনিষ্ট থেকে অনেক নবীন শিক্ষকরাও মুক্ত নয়।

মোটকথা-

برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا

ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔

বাগান বিরান হওয়ার জন্য যখন একটি পেঁচাই যথেষ্ট হয়, প্রতিটি ডালে পেঁচা বসে থাকলে সেই বাগানের পরিণতি কী দাঁড়ায়?

কওমী মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই এ প্রবাদের পাত্র হতে চলেছে। এ সকল বিষয়ে এখন থেকেই খুব সতর্কতা অবলম্বন না করলে কওমী শিক্ষায় মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে এটা আমাদের মুরব্বীগণের প্রবল আশঙ্কা। বড়দের দীর্ঘদিনের সাহচর্যে আমরা বিষয়গুলো অনুধাবন করেছি। *রাবেতার* পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বিষয়গুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন তাদের সাধ্য-সীমায় এ অনিষ্টকর দিকগুলোর গতিপথে প্রতিরোধের দেয়াল নির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করার প্রয়োজন অনুভব করে।

السعي منا والإتمام من الله، وما علينا إلا البلاغ.

চেষ্টা করা আমাদের কাজ, পূর্ণতা দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাজ। আর পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।

কুফর, কাফের ও তাকফীর : একটি পর্যালোচনা (সমাপ্ত)

মুফতী হাফিজুর রহমান মাদারীপুরী

তাকফীর এবং চূড়ান্ত সতর্কতা

তাকফীরের সংজ্ঞা

তাকফীরের শাব্দিক অর্থ কোনো ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা। পরিভাষায় তাকফীর বলা হয় কোনো মুসলিমকে কোনো কারণে কাফের সাব্যস্ত করা।

তাকফীরের শ্রেণীভাগ

তাকফীর দুভাগে বিভক্ত (ক) বিধানিক তাকফীর (খ) অবিধানিক তাকফীর।

(ক) বিধানিক তাকফীর : যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের কর্ম ও ভাষ্যের মাঝে স্পষ্ট কুফর পাওয়া যায় তাহলে সে ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা বিধিসম্মত; বরং দ্বীন ও ইসলামের স্বার্থে এ শ্রেণীর মানুষকে কাফের সাব্যস্ত করা আবশ্যক। শরীয়াসম্মত মূলনীতির আলোকে কোনো ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলে সাব্যস্ত করাকে বিধানিক তাকফীর বলে।

(খ) অবিধানিক তাকফীর : স্পষ্ট কুফর ও শিরক বহির্ভূত কবীরা গুনাহ তথা বড় রকমের গুনাহের কারণে কোনো ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা অবৈধ ও অবিধানিক। এ ধরনের গুনাহের কারণে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করাকে অবিধানিক তাকফীর বলে।

তাকফীরীর সংজ্ঞা

যারা কুফরে আসগার তথা ছোট কুফর বা কবীরা গুনাহের কারণে যাকে তাকে কাফের সাব্যস্ত করে তাদেরকে পরিভাষায় তাকফীরী বলা হয়। এ শ্রেণীর অন্যতম সম্প্রদায় হলো আলী রাযি. এর যুগের খারিজী বা খাওয়ারেজ সম্প্রদায়।

ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের গ্রন্থগুলোতে কুফরী উক্তি ও কুফরী কর্মের বিবরণ দিয়েছেন। সেসব উক্তি ও কর্মকে কুফরী সাব্যস্ত করার অর্থ এই নয় যে, যার থেকে এসব প্রকাশিত হবে কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা ব্যতিরেকে এবং উদ্দেশ্য যাচাই বাছাই করা ছাড়াই তাকে কাফের বলে দেয়া হবে। বরং তাকে কাফের তখনই বলা হবে যখন উক্তিগুলোর এমন অর্থ ও মর্ম তার উদ্দেশ্য হবে যাতে কুফরী আকীদা ও ইসলামের কোনো জরুরী বিষয়ের অস্বীকৃতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

অর্থ : হে মুনিগণ যখন তোমরা আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন তোমরা যাচাই করে নিয়ো এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে তোমরা ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় বলো না তুমি মুমিন নও। কারণ আল্লাহর কাছে অনায়াস লব্ধ প্রচুর রয়েছে। (সূরা নিসা; আয়াত ৯৪)

ইমাম গাজালী রহ. বলেন, কাফের সাব্যস্ত করা না করার ব্যাপারটি সর্বক্ষেত্রে বোধগম্য হবে এমনটি ভাবা উচিত নয়। বরং কাফের সাব্যস্ত করাটা একটি শরয়ী বিধান। এর কারণে ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়াসহ রক্তপাত ও চিরস্থায়ী জাহান্নামস্থ হওয়ার বিধান চলে আসে। সুতরাং তাকফীর বা কাফের সাব্যস্ত-করণের মূল উৎস অন্যান্য শরয়ী বিধানের উৎসের মতোই। কখনো সুনিশ্চিতরূপ অনুধাবন করা যাবে, কখনো প্রবল ধারণা রূপে অনুধাবন করা যাবে। কখনো আবার তাতে সংশয় তৈরি হবে। যখন কাফের সাব্যস্ত করার বিষয়টি দ্বিধা ও সংশয়ের পর্যায়ে চলে যাবে তখন কাফের সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। কাফের সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ওই সব লোকই তাড়াহুড়া করে যাদের স্বভাবে অজ্ঞতা প্রবল। এখানে আরেকটি মূলনীতির ব্যাপারে সতর্ক করা আবশ্যক। আর তা হলো, অনেকে অনেক ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির দলীলের বিপরীত বক্তব্য গ্রহণ করে এবং ধারণা করে যে, দালীলিক এ মূলছত্রটি ব্যাখ্যা উপযোগী। কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে দূর-নিকটের কোনো রকম ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে না। এমন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া কুফরী কাজ। এ ধরনের ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যদিও তার ধারণায় বিষয়টি ব্যাখ্যাযোগ্য। (ফাইসালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামি ওয়ায যান্দাকাহ; পৃষ্ঠা ৬৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ

অর্থ : যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, হে কাফের; তাহলে তাদের একজন কুফরের উপযুক্ত হয়ে যায় যদি সম্বোধিত ব্যক্তি বাস্তবে কাফের হয়ে থাকে। আর যদি সে বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে কুফরের বিষয়টি বক্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২২৫)

হাদীসটিতে কেউ বাস্তবে কাফের না হওয়া স্বত্ত্বেও তাকে কাফের বলা হলে বক্তা নিজেই কাফের হয়ে যাবে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে অনেক ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসটিকে হুমকিদান ও ভীতিপ্রদর্শন অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন নামায বর্জনকারী ব্যক্তিকে কাফের হয়ে গেছে বলে ধমকি দেয়া হয়েছে। বস্তুত যে ব্যক্তির আকীদায় কোনো কুফর নেই আমল তার আমল যতই মন্দ হোক তাকে কাফের বলা যাবে না। এমন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেয়া হলে আখ্যাদানকারীর ঈমান ঝুঁকিতে পড়ে যায়। কারণ তাকে কাফের বলার দ্বারা তার ঈমানকেই কুফর বলা হয়ে যায়।

ফুকাহায়ে কেরাম যতক্ষণ পর্যন্ত কারো কুফরী বিশ্বাস বা কুফরী উক্তির কোনো শরীয়াসঙ্গত ব্যাখ্যা করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা জায়েয মনে করেননি। তবুও যদি কেউ তাড়াহুড়া বশত তাকে কাফের বলে ফেলে তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে বক্তা কাফের হবে না। তবে তাড়াহুড়া করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

যদি কোনো ক্ষেত্রে কুফর সাব্যস্তকারী একাধিক দিক থাকে আর কুফরের বিপরীত একটি দিক থাকে তাহলে মুফতীর জন্য আবশ্যক হলো ওই একটি দিককেই প্রাধান্য দেয়া। তবে উক্তিকারী যদি কুফর সাব্যস্তকারী দিকটিকেই তার উদ্দীষ্ট বিষয় বলে স্পষ্ট করে দেয় তখন ওই ব্যাখ্য কোনো কাজে আসবে না। সারকথা, মুসলিমকে ভুলভাবে কাফের আখ্যাদানকে হাদীসে কুফরী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কুফরী সাব্যস্ত করা ভীতি প্রদর্শনের জন্য হোক বা প্রকৃত কুফরী হোক সর্বাবস্থায় হাদীস থেকে ইসলামের দাবিদার কাউকে কাফের আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক প্রমাণিত হয়। এ কারণে যেসব উক্তি কুফরী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ

রয়েছে সেসব উক্তির কারণে কাফের বলাকে মুফতিয়ানে কেরাম জায়েয মনে করেননি।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, জেনে রাখুন, আমাদের ফিকহের গ্রন্থগুলোতে এসেছে, যে ব্যক্তির মাঝে কুফরের নিরানব্বইটি দিক এবং ইসলামের একটি দিক পাওয়া যাবে তার উপরে কুফরের বিধান আরোপ করা হবে না। যাদের ফিকহ বিষয়ক জানাশোনা নেই তাদের কাছে ফকীহদের এ উক্তিটি ধোয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে এর মর্মার্থ অনুধাবনে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। তারা মনে করে, যদি কেউ উপর্যুক্ত সংখ্যক কুফরী কর্মে লিপ্ত হয় এবং একটি ইসলামের কর্ম করে তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এতে ন্যূনতম সংশয় সন্দেহ নেই। এটা কী করে সম্ভব? অথচ একজন মুসলিম একটি কুফরের কাজ করলেই কাফের হয়ে যায়। তাহলে যে ব্যক্তির অধিকাংশ কাজই কুফরী তার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? বস্তুত ফকীহদের উক্ত বক্তব্যটি ছিলো উক্তি বিষয়ক। তারা বক্তব্যটিকে কর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করে দিয়েছে। (ফয়যুল বারী শরহু সাহীহিল বুখারী, ৫/৩২৪)

তাকফীরের ভিন্ন একটি শ্রেণীভাগ

তাকফীর দু' প্রকার-

(১) তাকফীরে মুতলাক বা সাধারণ তাকফীর : তাকফীরে মুতলাক মানে হলো, নির্দিষ্ট করে কারো নাম না নিয়ে যে ব্যক্তি বা দলের মাঝে কুফর পাওয়া যাবে তাকে কাফের সাব্যস্ত করা।

(২) তাকফীরে মুআইয়ান বা সুনির্দিষ্ট তাকফীর : তাকফীরে মুআইয়ান অর্থ হলো, কুফর পাওয়ার কারণে ব্যক্তি বা দলের নামোল্লেখ করে কাফের সাব্যস্ত করা। তাকফীরে মুআইয়ানের ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতা আবশ্যক। ব্যক্তি বা দলের মাঝে নিশ্চিত কুফর আছে কি না সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে হবে। শুধুমাত্র ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে তাকফীরে মুআইয়ান বা নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না।

কেউ কেউ আছেন যে কাউকে কাফের বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শরীয়তের বিপরীত কিংবা নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কিছু পেলে ভাবনাহীনভাবে কাফের আখ্যা দিয়ে ফেলেন। শাখাগত মতভিন্নতার কারণেও কাফের শব্দের মত স্পর্শকাতর শব্দটি প্রয়োগ করে বসেন। অন্যদিকে কারো কারো বক্তব্যে ইসলামের বাস্তবতাই হারিয়ে যায়। তারা মুসলিম দাবিদার প্রত্যেককেই নির্বিঘ্নে মুসলিম বলে দেন। সে পূর্ণ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের বিধি বিধান অস্বীকার কিংবা অবজ্ঞা করলেও তিনি তাদের কাছে মুসলিম থেকে যান। তাদের মতে ইসলামের সাথে সব ধরনের কুফরের সহবাস্থান সম্ভব। তাদের নিকট অপরাপর অসত্য ধর্মের মতো ইসলাম একটি জাতীয় উপাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যক্তি যে বিশ্বাসই পোষণ করুক, যে উক্তিই করুক বা যে কর্মই করুক সে সর্বাবস্থায় মুসলিম থেকে যায়। এটাকে তারা চিন্তার ব্যাপকতা ও সাহসের ব্যাপ্তি বলে প্রকাশ করে। এ উভয় প্রবণতাই ঈমান বিধ্বংসী এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম ক্ষতিকর।

কাফেরকে মুসলিম আখ্যা দেয়াও চরম অপরাধ

মুসলিমকে কাফের বলা যায় না। বাস্তবিক কোনো মুসলিমকে কাফের বলা হলে বক্তা নিজেই কুফরীতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এটা বেশ সিদ্ধ। এটা সাধারণত সকলের জানা কথা। কিন্তু কোনো কাফেরকে মুসলিম আখ্যা দেয়াও যে মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়ার মত গুরুতর অপরাধ এটা আমাদের অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

অর্থ : আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? (সূরা নিসা; আয়াত ৮৮)

বস্তুত কোনো নিশ্চিত কাফেরকে মুসলিম আখ্যা দেয়াও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপরাধ এবং নিজের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলার নামান্তর। কারণ তখন কুফরকে ঈমান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে যদি স্বজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক কুফরকে ঈমান ও ঈমানকে কুফর বলা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে কুফর হবে। স্বজ্ঞানে ও ইচ্ছাপূর্বক না হলে কুফরের ঝুঁকি থেকে তো অবশ্যই মুক্ত নয়। উপরন্তু কোনো কাফেরকে মুসলিম বলাটা শুধু শব্দের উদারতা নয়; বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সমাজের উপর বিরাট অবিচার বটে। কারণ তাতে পুরো উম্মাহর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কাফের আখ্যাদানকারী ব্যক্তির সামান্য অসতর্কতা যেমন একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারে। তদ্রূপ নিশ্চিত না হয়ে কাউকে মুসলিম আখ্যা দেয়ার দ্বারা ইসলামের একজন শত্রু ইসলামী সমাজের আস্তিনের সাপ ও কপট বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এ উভয় ঝুঁকিই মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম ভয়ঙ্কর এবং তার পরিণতি সুদূরপ্রসারী।

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আলজুওয়াইনী রহ. বলেন, কোনো কাফেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো তদ্রূপ কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়া উভয়টিই গুরুতর বিষয়। (শারহুশ শিফা ২/৫০০)

আমরা অনেক সময় মনে করি, শুধু কালিমা পড়লেই বুঝি মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এটি একটি অসত্য ধারণা। এ জায়গাটিতে এসে আমাদের অনেকের মাঝে একটা অন্ধ-আবেগ কাজ করে। আমরা বলি, খুঁটে খুঁটে লোকজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার কি প্রয়োজন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার জন্য আসেননি। এসেছে ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম থেকে কাউকে বের করে দেয়া যায় না। ব্যক্তি নিজে কুফরে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ যদি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় এবং ইসলাম সে বের হয়ে গেছে বলে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাকে ইসলামের ভিতরে জোর করে ধরে রাখার অধিকার কারো নেই। তদ্রূপ প্রকৃত একজন মুসলমানকে কাফের বলার অধিকার কারো নেই চাই সে আমলগত দিক থেকে যত দুর্বলই হোক না কেন।

অকাট্য প্রমাণ

প্রমাণিত হওয়ার দিক থেকে ইসলামের বিধানাবলী বিভিন্ন স্তরের। স্তরভেদে সে বিধানও বিভিন্ন স্তরের। একজন মুসলিম একমাত্র ওই সকল বিধান অস্বীকার করলে মুরতাদ বা কাফের হবে যেগুলো ইসলামী শরীয়াতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো, কোনো বিষয় কুরআন বা এমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি জনপদে এতো অধিক যে মিথ্যার উপর তাদের সকলের একমত হওয়া অসম্ভব। পরিভাষায় একেই তাওয়াতুর বলে। আর এ জাতীয় বর্ণনাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে।

ইবরাহীম লাকানী মালেকী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করবে তাকে

কুফরের কারণে হত্যা করা হবে, দণ্ড হিসেবে নয়। (জাওহারাতুত তাওহীদ; পৃষ্ঠা ৮)

ব্যাখ্যাকার বলেন, এর উপর উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। মাতুরিদী আলেমগণ কোনো বিষয় অকাট্য হলে তার অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত করেন; জরুরী না হলেও। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৮)

জরুরিয়্যাতে দ্বীন

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া, চুরি ডাকাতি, মদপান জাতীয় জিনিস হারাম হওয়া এধরনের অকাট্য বিষয়কে জরুরিয়্যাতে দ্বীন বলা হয়। তবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে বিধানগুলো এ স্তরের প্রসিদ্ধ নয় সেগুলো অকাট্য তবে জরুরিয়াতে দ্বীন নয়। জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো একটি অস্বীকার করলে উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। না জানা ও অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে অপারগতা ও ওজর হিসেবে গণ্য হবে না।

জরুরিয়্যাতে দ্বীনকে অস্বীকার করা মানে যেসব ব্যাপারে স্বভাবত আবশ্যকীয়ভাবে মুসলমানমাত্রই জ্ঞাত থাকে সে রকম বিষয়ের যে কোনো অংশকে অস্বীকার করা। (ইসারুল হাক্কি আলাল খালক; পৃষ্ঠা ৩৭৬)

হাদীস, ফিকহ ও আকায়িদ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে কুফরের বিবরণে ইনকার তথা অস্বীকার শব্দটি বার বার এসেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অস্বীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বীকার না করা। সুতরাং কেউ যদি জরুরিয়্যাতে দ্বীন অন্তর্গত কোনো বিষয়কে অস্বীকার না করে আবার স্বীকারও না করে –চাই সেটা অবিশ্বাসের কারণে হোক বা সন্দেহের কারণে হোক– তাহলে সে ব্যক্তিও কাফের বলে বিবেচিত হবে। (মাজমূউল ফাতাওয়া লিইবনি তাইমিয়া ১৩/৩৩৫)

হানাফী ফকীহদের মতানুসারে জরুরিয়্যাতে দ্বীনের অন্তর্গত নয় এমন বিষয় অস্বীকার করা হলে তাকে কাফের বলা হবে না। প্রথমে তাকে জানানো হবে, এটা ইসলামের অকাট্য বিধান, এটা অস্বীকার করা কুফরী। এরপরও যদি সে তার অস্বীকৃতিতে অটল থাকে তাহলে তাকে কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, যে বিধান জরুরিয়্যাতে দ্বীনের স্তরে পৌঁছেনি হানাফী ফকীহদের বাহ্যিক বক্তব্য অনুসারে সে বিধানের অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেয়া হবে। কারণ কাফের আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে তারা অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেননি। ... তবে তাদের এ উক্তিকে ওই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে যখন অস্বীকারকারী ব্যক্তি বিধানটিকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলে জানবে। (আল-মুসামারা; পৃষ্ঠা ১৪৯)

জরুরিয়্যাতে দ্বীন বা স্বভাবত আবশ্যকীয়ভাবে যে ব্যাপারে মুসলমানমাত্রই জ্ঞাত বিষয়ে আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, এসব বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের ওই সব অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয় যেগুলো দ্বীনের অংশ হওয়ার ব্যাপারটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন, তাওহীদ, নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত, পুনরুত্থান, শাস্তি, প্রতিদান, নামায, রোযা আবশ্যক হওয়া এবং মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন হতে পারে, এমন উদাসীন মুসলমানও তো আছে যারা এমন সাধারণ বিষয়গুলোও জানে না তাদের কী বিধান হবে? এবং দ্বীনের কোনো বিষয় এ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার মানদণ্ড কী? জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, ব্যাপক প্রসিদ্ধির মানদণ্ড হলো, সাধারণ মসলমানের সকল স্তরে এগুলোর সংবাদটি পৌঁছে যাওয়া। এখন স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেককেই জানতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়। তদ্রূপ মসলমানের যে স্তরটি দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ রাখে না তাদের কাছে পৌঁছাটাও আবশ্যক নয়। বরং মুসলমানের যে স্তরগুলো দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ রাখে তাদের কাছে পৌঁছে গেলেই বিষয়গুলো স্বভাবত আবশ্যকীয়ভাবে মুসলমানমাত্রই জ্ঞাত বলে প্রমাণিত হবে। (ইকফারুল মুলহিদ্বীন ফী জরুরিয়্যাতিদ দ্বীন; পৃষ্ঠা ২-৩)

কাফেরকে কাফের বলা আল্লাহর বিধান

কেউ যদি শরীয়ানীতির আলোকে কাফের হয়ে যায় এবং কোনো মুফতী বা আলেম শরীয়ানীতি পরিপালন করে তাকে কাফের সাব্যস্ত করেন তাহলে তাকে মন্দ বলার কোনো অবকাশ নেই। তারা কাফের বানান বলে বিরূপ মন্তব্য করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ কাউকে কুফরের কারণে কাফের সাব্যস্ত করা আল্লাহর বিধান। এ বিধান প্রকাশ করতে একজন মুফতী দায়বদ্ধ। বস্তুত কেউ কাউকে কাফের বানায় না, বানাতে পারেও না। বরং ব্যক্তি কুফরী বিশ্বাস লালন ও কুফরী আচার-উচ্চারণের কাফের হয়। মুফতীগণ দ্বীনী বৃহৎ স্বার্থে এবং ইসলামী শরীয়ার বিধান পালনার্থে তাদের কাফের হওয়ার সংবাদ পরিবেশন করেন মাত্র। এটা একজন দায়িত্বশীল ও প্রাজ্ঞ মুফতীর আবশ্যিক দায়িত্বও বটে।

মুমিন হতে হলে করণীয়

ইসলাম নিজ অনুসারীদের জন্য একটি ওয়াহীভিত্তিক নীতিমালা উপস্থান করেছে। যে ব্যক্তি এ নীতিকে প্রশান্ত মনে নিষ্ঠার সাথে মেনে নিবে এবং সে নীতি অনুসরণের ব্যাপারে কোনো রকমের সংকোচ অনুভব করবে না সে মুসলিম। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের কোনো অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করবে নিঃসন্দেহে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। ইসলাম তাকে কোনো ক্রমেই গ্রহণ করবে না। তার দ্বারা মুসলিম আদমশুমারি বৃদ্ধি করা ইসলাম ও মুসলমানের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানার শামিল। এ জাতীয় ব্যক্তিদের ইসলামভুক্ত করার দ্বারা অসংখ্য মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা তৈরি হয়।

শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করার দ্বারাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয় না; বরং তাঁর শ্রবণ, দর্শন, শক্তি-সক্ষমতা প্রভৃতি সকল গুণাবলীকে পূর্ণাঙ্গরূপে সেভাবে স্বীকার করা আবশ্যক যেভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নতুবা সব ধর্মের মানুষই মুসলিম হয়ে যাবে। কারণ সব ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ : কিন্তু তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার দেয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা; আয়াত ৬৫)

জা'ফর সাদিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায় যদি আল্লাহর

ইবাদাত করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, রমাযানের রোযা রাখে এবং আল্লাহর ঘরে হজ্জ করে এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজের ক্ষেত্রে বলে, তিনি যা করেছেন তার বিপরীতটি কেন করলেন না? অথবা তা পরিপালনের ব্যাপারে মনে কোনো দ্বিধা রাখে তাহলে তারা মুশরিক হয়ে যাবে। (রূহুল মা'আনী ৬/৬৫)

যেসব কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায়

১। ঈমানের কোনো রুকন, আল্লাহ, তাঁর কোনো নাম বা গুণ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, পরকাল, বিচার দিবস এবং তাকদীর বা ভাগ্য ইত্যাদিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা।

২। সর্বসম্মত কোনো ফরজ বা তার আবশ্যকীয়তাকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

৩। সর্বসম্মত কোনো হারাম কাজ বা বস্তুকে হালাল বিশ্বাস করা। যেমন ব্যভিচার, মদ, সুদ, ঘুষ, হত্যা ইত্যাদি। তদ্রূপ হালাল কাজ বা বস্তুকে হারাম বিশ্বাস করা।

৪। আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন সৃষ্টির ইবাদাত করা। যেমন নবী, ওলী, জিন, মাটি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির ইবাদাত করা, এদের কাছে মুক্তি বা সাহায্য চাওয়া, ইবাদাতের নিয়তে এদের সিজদা করা।

৫। ভিন্ন ধর্মমতকে শুদ্ধ বা আল্লাহর কাছে গৃহীত মনে করা বা ইসলামের সমতুল্য মনে করা।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের তুলনায় অন্যের আদর্শকে উত্তম মনে করা। কুরআন সুন্নাহের আইনের তুলনায় মানব রচিত কোনো আইন বা সংবিধানকে উত্তম মনে করা বা সমপর্যায়ের মনে করা।

৭। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বর্তমানে অচল মনে করা। ইসলামী আইন ব্যবস্থাকে বর্তমানে অনুপযুক্ত মনে করা।

৮। ইসলামী শরীয়তকে পার্সোনাল ল বা ব্যক্তিগত জীবন বিধান মনে করা। রাজনীতি বা অন্য কোনো নীতির সাথে ইসলামকে সম্পর্কহীন মনে করা।

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত জীবন ব্যবস্থার কোনো অংশকে ঘৃণা করা বা অবজ্ঞা করা।

১০। ইসলামের বিধান বা নিদর্শন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা বা ঠাট্টা-উপহাস করা।

১১। হাকীকত বা মারেফতের উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলে ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করতে হয় না বলে বিশ্বাস করা।

১২। রাশিফলে বিশ্বাস করা।

১৩। বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা।

১৪। ইসলামকে মসজিদ মাদরাসা ও ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সীমাবদ্ধ মনে করা।

১৫। পৌত্তলিক ধর্মের নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনকে বৈধ মনে করা।

১৬। মানব ধর্মকেই বড় ধর্ম বলে বিশ্বাস করা।

১৭। কোনো দেব-দেবীর আগমনে ফসল ভালো হবে বলে ব্যক্ত করা বা বিশ্বাস করা।

১৮। প্রতিমাকে সম্মান করা বা পূজা আর্চনা করা।

কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত বিধান

শরয়ী নীতিমালা ও সুনিশ্চিত প্রমাণের আলোকে যখন কেউ কাফের বলে সাব্যস্ত হবে তখন তার ক্ষেত্রে কিছু বিধান প্রযোজ্য হবে।

১। ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তিত অভিভাবকত্ব অধিকার তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। সে আর কোনো মুসলিমের অভিভাবক হতে পারবে না।

২। কা'বা শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। তার জবাইকৃত পশুর গোশত বৈধ হবে না।

৩। কোনো মুসলিম নারীর সাথে তার বিবাহ বৈধ হবে না। বিবাহ হয়ে থাকলে মুসলিম স্ত্রীর জন্য তার সাথে থাকা হারাম হবে।

৪। তার জন্য জানাযা, কাফন, দাফন ও রহমত-মাগফিরাতের দুআ করা হারাম হবে।

৫। মুসলিম কবরস্তানে তাকে দাফন করা যাবে না।

৬। সে তার কোনো আত্মীয়ের ওয়ারিশ হবে না এবং তার মুসলিম পরিজনরাও তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশ হবে না।

পরিশিষ্ট

বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয় স্পষ্ট হলে তার উপকারিতা ও অপকারিতা গ্রহণ বর্জন সহজ। কিন্তু পরিচয় অস্পষ্ট হলে বিষয়টা অতিশয় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। যদি ব্যক্তি বা বস্তুটা ক্ষতিকর হয় তাহলে তার ক্ষতিসাধনটা হয় ভয়াবহ রকমের। ছদ্মবেশে সে ক্ষতিসাধনের গভীর তলদেশে চলে যেতে পারে। ঠিক তদ্রূপ ব্যক্তি যদি স্বঘোষিত কাফের হয় তাহলে তার ক্ষতির মাত্রাটা সামগ্রিক বিবেচনায় কম। কিন্তু সে যদি মুসলিম নামে ছদ্মবেশী কাফের হয় তাহলে ক্ষতির মাত্রাটা হয়ে উঠে ভয়াবহ রকমের। এ জাতীয় ভয়ঙ্কর ক্ষতিগুলো চর্মচোখে সচরাচর ধরা পড়ে না। কিন্তু অন্তরালে তার ক্ষতির মাত্রায় ভয়াবহরূপে উত্তোরত্তর প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আজ ইলহাদ ও যান্দাকা নামের ছদ্মবেশী কুফরের কারণে ইসলামে প্রবেশের তুলনায় ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যবেক্ষণ সহজে অনুধাবনযোগ্য হবার মতো নয়। বাহ্য পর্যালোচনায় ইসলামে প্রবেশের সংখ্যাটিকেই অধিক মনে হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সূচনাটা শেকড় থেকে হলে উল্টো চিত্র বেরিয়ে আসবে বলেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কা হয়। আজ ঈমানের আলোচনা হয়। কিন্তু কুফরের আলোচনা হয় না বললেই চলে। অথচ ঈমানের পূর্ণতার জন্য কুফরের আলোচনাটাও বেশ প্রাসঙ্গিক ও আবশ্যক। কুফর বিষয়টা স্পর্শকাতর হলেও এর আলোচনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় কুফর বিষয়ক উন্মুক্ত কথন লেখনটা বেশ অনিরাপদ। কারণ ক্ষমতার মগডাল থেকে নিয়ে শিক্ষানিলয়গুলো পর্যন্ত নানা নীতি, থিউরি, উদারতা ও কালচারের নামে হরেক রকমের কুফর যান্দাকার ছড়াছড়ি। সাথে আছে ধর্মীয় শিরোনামের অসংখ্য অগণিত ইলহাদ যান্দাকার তুমুল প্রবাহ। নিরাপদ না হলেও নমনীয় ও কৌশলী উপস্থাপনায় উক্তি ও কর্ম বিষয়ক কুফরের প্রচলিত প্রলম্বিত তালিকাটা ইসলাম ও উম্মাহর বৃহৎ স্বার্থে একটু বিষদভাবেই জনসম্মুখে তুলে ধরা প্রয়োজন। নতুবা ইলহাদ ও যান্দাকার এ গতিময় স্রোতধারাকে রুখে দেয়া বড় দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ভয়াবহতম স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে আলাদা করে ভাবার ও কাজ করার তাওফিক দান করুন।

পুনশ্চঃ লেখাটি আল্লামা কাশ্মীরী রহ. রচিত গ্রন্থ ইকফারুল মুলহিদীন ফী জরুরিয়্যাতিদ দ্বীন ও মুফতী শফী রহ. লিখিত দুটি নিবন্ধ 'উসূলুল ইফকার ইলা উসূলিল ইকফার' ও 'ঈমান আওর কুফর কুরআন কি রোশনী মেঁ' এর ছায়া অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করা হয়েছে।

লেখক : আমীনুত তা'লীম
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

তা'লীম ও তাবলীগের সমোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ফেনী শর্শদী দারুল উলূমের প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস

মুফতী আব্দুল আযীয রহ.

মাওলানা জুনাইদ আহমদ

মুফতী আব্দুল আযীয রহ. (লাকসামী হুযূর) আলোকিত এক মহান সাধকের নাম। যিনি দ্বীনী ইলম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের প্রবাদপ্রতীম নিরব সাধক এবং সফল ব্যক্তিত্ব। আমাদের বরেণ্য এই মহান আলেমে দ্বীনের বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবনের উপর প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ ও অগণিত রচনাবলী। নিম্নে তার সেই সাফল্যময় জীবনের সামান্য তুলে ধরা হলো-

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত রহ. ১৯৩৩ ঈসায়ীতে উলামা-মাশায়েখের জন্মভূমি খ্যাত কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত ভাটিসতলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনশি মিন্নাত আলী রহ.। স্থানীয় মক্তবেই পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর প্রেমনল প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে যুক্তিখোলা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে জামা'আতে নাহুম পর্যন্ত পড়ে নাঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত মৌকরা ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে হাশতুম ও হাফতুম দু' জামাআত পড়েন। এ সময়েই তাঁর মনে ইলম অন্বেষণের অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়। সে আশা বাস্তবায়নের জন্য চলে যান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। এখান থেকেই তিনি ১৩৮১ হিজরী মোতাবেক ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাসমাপন করেন। হাটহাজারী মাদরাসায় তিনি ফুনুনাতসহ তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইফতায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষাজীবনের এ দীর্ঘ সময়ে তিনি সবসময় প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

হাটহাজারী মাদরাসায় সে সময়কার দেশের শ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস, আদীব, মুফতী, মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। লাকসামের হুযূর রহ. এর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ., খলীফায়ে থানবী আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব রহ., শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম রহ., মুফতী আহমদুল হক রহ., আল্লামা আব্দুল আযীয রহ., শারেহে মিশকাত আল্লামা আবুল হাসান রহ., আল্লামা হামেদ রহ. ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.।

ইলমী গভীরতা ও উলামায়ে কেরামের স্বীকৃতি

মুফতী আব্দুল আযীয রহ. এর সহপাঠী শাইখুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী রহ. বলেন, 'আমি মাওলানা আব্দুল আযীয রহ. এর সহপাঠী ছিলাম। তিনি ছাত্রযামানা থেকেই অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেজগার ও প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি হাটহাজারীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সবসময় নাম্বারে আউয়াল (প্রথম) হতেন। ছাত্ররা তাঁর তাকরারে বসার জন্য ব্যাকুল থাকত। সকল আসাতিযায়ে কিরামের নিকট তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন।'

তিনি হাটহাজারীতে পড়াকালীন একবার আল্লামা আবুল হাসান রহ. হিদায়ার দরসে একটি মাসআলা ব্যাখ্যা করেন। তখন ছাত্র আব্দুল আযীয রহ. উস্তাদের অনুমতি নিয়ে সবিনয়ে ভিন্ন আরেকটি ব্যাখ্যা করেন। আল্লামা আবুল হাসান রহ. এর নিকট নিজের ব্যাখ্যার চেয়ে ছাত্রের ব্যাখ্যা বেশি পছন্দ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'আব্দুল আযীয যতটুকু বুঝেছে, আমার মনে হয় কিতাবের হাশিয়া তথা টীকা-লেখকও ততটুকু বোঝেননি।'

হাটহাজারীর শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম রহ. বলতেন, 'হাটহাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস হওয়ার জন্য আব্দুল আযীযই যোগ্য।'

হাটহাজারীর সাবেক শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল আযীয রহ. বলতেন, 'আমি জীবনে চারজন যী-ইস্তেদাদ (যোগ্যতাসম্পন্ন) ও যাকী (মেধাবী) ছাত্র পেয়েছি যাদের নজির-তুলনা নেই। তাদের মধ্যে আব্দুল আযীয একজন।'

বিশিষ্ট লেখক ও জীবনীকার মুফতী হিফযুর রহমান দা.বা. বলেন, 'আমরা যখন হাটহাজারী মাদরাসায় পড়তাম তখন প্রায়ই আসাতিযায়ে কিরামের মুখে মুফতী আব্দুল আযীয রহ. এর সুনাম শুনতাম। আল্লামা হামেদ রহ. মসজিদে ছাত্রদের নসীহত করার সময় মুফতী আব্দুল আযীয রহ. এর মেধা ও ইলমী গভীরতার কথা তুলে ধরতেন।'

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকার শাইখুল হাদীস মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম দা.বা. বলেন, 'মুফতী আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেম। কিন্তু হযরত নিজেকে সবসময় গোপন রাখার চেষ্টা করতেন।'

কর্মজীবন

ফারেগ হওয়ার পর তিনি ফেনীর ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ শর্শদী দারুল উলূমের উস্তাদ হিসেবে নিয়োজিত হন। তিনি আমৃত্যু সে প্রতিষ্ঠানে প্রধান মুফতী, শাইখুল হাদীস ও নাযিমে তা'লীমাতের দায়িত্ব পালন করেন। এ দীর্ঘসময়ে কুমিল্লা বরুড়া মাদরাসা, ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসাসহ রাজধানী ঢাকার অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী হিসেবে যোগদানের আহ্বান এলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখনই শর্শদী মাদরাসা ত্যাগ করার প্রস্তাব আসে তখনই স্বপ্নে শর্শদী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, থানবী রহ. এর আজাল্লে খলীফা হযরত মাও. নূরবখশ রহ. আমাকে বলেন, 'আপনি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন?' এজন্য আমি শর্শদী মাদরাসা ছাড়তে পারি না। এভাবেই তিনি ৪৮/৫০ বছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন কাটিয়ে দেন। শর্শদী মাদরাসায় তিনি বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ, হিদায়া, তাফসীরে জালালাইন, সিরাজী, কুতবী'র মত বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সব কিতাবের দরস প্রদান করেছেন।

হযরতের বিশিষ্ট শাগরিদ, পীরজঙ্গি মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী সুলাইমান ইবনে আলী রহ. লেখেন, 'আমার উস্তাদ মুফতী আব্দুল আযীয রহ. এর দরস ছিল খুবই

চমৎকার। যে কোনো কিতাব তাঁর নিকট পানির মত সহজ ছিল। শর্শদী মাদরাসার অনেক সিনিয়র উস্তাদও যে কোনো ইলমীবিষয়ে জটিলতা বোধ করলে তাঁর কাছে ছুটে যেতেন।'

হযরতের বিশিষ্ট শাগরেদ, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকার নায়েবে মুহতামিম ও সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার দা.বা. লেখেন, 'একবার হযরত মুফতী সাহেব রহ. মালিবাগ জামিয়ায় এলেন। আসার পর আমাকে বললেন, 'আমাকে মিশকাত কিতাব দিন! আমি একটু মুতালাআ করব।' আমি দেখলাম, হযরত মিশকাত কিতাবের বিভিন্ন হাশিয়া কেটে দিচ্ছেন, আবার পাশে কিছু লিখেও দিচ্ছেন। হযরত চলে যাওয়ার পর আমি ঐ হাশিয়াগুলো মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখি, হযরত যা লিখেছেন তা সঠিক আর হাশিয়াগুলো ভুল ছিল।'

হযরতের আরেক বিশিষ্ট শাগরেদ ফেনী জামিয়া মাদানিয়ার মুহতামিম মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী দা.বা. বলেন, 'আমি শর্শদী মাদরাসায় পড়াকালীন হযরতকে দেখলাম, হযরত এক কিতাবের হাশিয়া বেশ কয়েক জায়গায় কেটে দিয়েছেন এবং এর পাশে নিজ থেকে আরেকটি হাশিয়া লিখে দিয়েছেন। আমার কাছে এটা দেখে খারাপ লাগল। এ কিতাবের হাশিয়া যে কিতাব থেকে আনা হয়েছে সে কিতাব শর্শদী মাদরাসায় তখন ছিল না, তবে হাটহাজারী মাদরাসায় ছিল। একদিন হাটহাজারী মাদরাসায় গিয়ে মূল কিতাব দেখার পর আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলাম। হযরত যেটা লিখেছেন সেটাই সঠিক আর হাশিয়াটা ছিল সম্পূর্ণ ভুল!'

ফেনী জামি'আ রশীদিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আল্লামা মুফতী শহীদুল্লাহ দা.বা. বলেন, 'আমরা যখন হাটহাজারী মাদরাসায় পড়তাম তখন হাটহাজারী মাদরাসার সকল উস্তাযই বলতেন, মুফতী আব্দুল আযীযের মত বিজ্ঞ আলেম বাংলাদেশে কমই আছে। পরে যখন আমার জামি'আ রশিদিয়ার সুবাদে ফেনীতে খিদমাত করার সুযোগ হয় তখন আমার কাছে মনে হলো, হাটহাজারীর উস্তাদগণ তাঁর এত প্রশংসা কেন করতেন? তারপর একদিন আমি হযরতকে মাদরাসায় পেয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করলাম। তখন আমার ভুল ভেঙ্গে যায়। হযরত অত্যন্ত চমৎকারভাবে সকল মাসআলার সমাধান দিলেন। সাথে সাথে বলে দিলেন, এ মাসআলার সুন্দর আলোচনা অমুক কিতাবে আছে, ঐ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা অমুক কিতাবে আছে। বলতে বলতে তিনি কিতাব বের করেও দেখাচ্ছিলেন আর আমি শুধু আশ্চর্য অভিভূত হচ্ছিলাম।'

আরবী ভাষায় পারদর্শিতা

হযরত রহ. আরবীভাষা ও সাহিত্যে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, আরবী ভাষাভাষী হওয়া ছাড়া অন্যদের জন্য এত বিশুদ্ধভাবে অনর্গল আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। আরবগণও তার এমন বিশুদ্ধ সাবলীল আরবী দক্ষতায় মুগ্ধ হতেন। সহজেই তাকে অনারবী হিসেবে মেনে নিতে পারতেন না। টঙ্গীতে ইজতিমার ময়দানে আরব জামাআতের অনুবাদক ছিলেন তিনি।

একবার হাটহাজারী মাদরাসায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরতকে বয়ান করতে দেয়া হলে তিনি এমন প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ আরবীতে বয়ান প্রদান করেন যে, তখনকার মুহতামিম আল্লামা হামেদ রহ. ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'দেখেছ! একে বলে আলেম, যাকে নিয়ে হাটহাজারী মাদরাসা গর্ব করে থাকে।'

তা'লীম ও তাবলীগের মধ্যে সমন্বয়

মুফতী আব্দুল আযীয রহ. আলেম তৈরির পাশাপাশি আওয়ামদের দ্বীনী তারাক্কী নিয়েও চিন্তা করতেন। তাই তিনি দ্বীনের মশাল নিয়ে কতো দেশ-বিদেশ চষে বেড়িয়েছেন তার কোন হিসেব নেই। আল্লাহভোলা মানুষগুলোকে দ্বীনের পথে আনতে মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটেছেন। ফেনী জেলার শর্শদী ইউনিয়নে এমন কোনো বাড়ি নেই, যে বাড়িতে হযরত মুফতী সাহেব রহ. দাওয়াতের মিশন নিয়ে যাননি আর সে বাড়ির মানুষ তাঁর পকেটে থাকা পঞ্চাশ পয়সার নাবিস্কো লজেন্স খায়নি। হযরতের এ লজেন্স যার পেটে একবার গিয়েছে, সে তিনদিনের জন্য হলেও তাবলীগে গিয়েছে।

কাউকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে হযরত মুফতী সাহেব রহ. এর কৌশল ছিল, প্রথমে তাকে নাস্তা করাতেন, তারপর তাকে দাওয়াত দিতেন। তিনি প্রতিদিন আসর বা ফজরের নামায এলাকার ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে গিয়ে পড়তেন এবং সেখানকার মুসল্লীদের নিয়ে দ্বীনী আলোচনা করে দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে তাঁর এলাকায় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গণমানুষের সাথে তাঁর একটা আত্মার সম্পর্ক হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিভিন্ন শ্রেণির মন্দ স্বভাবের মানুষও তাঁকে দেখলে আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করতো। তাঁর সাথে এহেন দ্বীনী সম্পর্কের সুবাদে সবসময় মাদরাসার সাথেও সাধারণ মানুষের একটা সুসম্পর্ক বহাল থাকতো। মাদরাসা, মসজিদ, হাটবাজার, বাসস্ট্যান্ড– যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। নামায-রোযার কথা বলতেন। রিকশা ও সিএনজির চালককে জিজ্ঞেস করতেন, নামায পড়েছে কিনা। না পড়ে থাকলে প্রথমে নামায পড়িয়ে নিতেন। এরপর নির্ধারিত ভাড়া থেকে বেশি টাকা দিয়ে বিদায় করতেন।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা ইসহাক ওবায়দী রহ. লেখেন, 'মুফতী আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন তা'লীম ও তাবলীগের বড় সমন্বয়ধর্মী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি হাদীসের দরস প্রদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি তাবলীগের কাজটিও সফলভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। কাকরাইল মসজিদ ও বিশ্ব ইজতেমার মাঠে উলামাদের ক্যাম্পে আমার মাত্র কয়েকবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তিনি বড় সদালাপী ছিলেন। আকর্ষণীয় হাসি দিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতেন। হৃদয়ের পুরোটাই দরদভরা মনে হত।'

একটি আশ্চর্য ঘটনা

মতিঝিল পীরজঙ্গি মাদরাসায় ১৯৯৩ ঈসায়ীতে দাওরায়ে হাদীসের দরসের ইফতিতাহের জন্য তাঁকে এবং তাঁর উস্তাদ হাটহাজারীর আল্লামা আব্দুল আযীয রহ. কে দাওয়াত করে আনা হয়। হাটহাজারীর আল্লামা আব্দুল আযীয রহ. মাদরাসার অফিসকক্ষে বসে ছিলেন। মুফতী আব্দুল আযীয রহ. অফিসে ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন– 'ও আব্দুল আযীয! তুঁই খেন আছ? গম আছন্না? আঁই তোঁয়ারে খইয়েদ্দে তুঁই ডঁর ডঁর হাদীসের কিতাব ফরাইবা। আর তুঁই আঁর খতা ন ফুনিয়ারে তুঁই তাবলীগ খর। (আব্দুল আযীয, তুমি কেমন আছ? আমি তোমাকে বললাম হাদীসের কিতাব পড়াতে, তুমি আমার কথা না শুনে তাবলীগ করছ!'

এ কথা শুনে মুফতী আব্দুল আযীয রহ. কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'সাহেবে হাদীস অর্থাৎ রাসুলেকারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমি কোনটা করবো?'

তখন আল্লামা আব্দুল আযীয রহ.ও কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'আজিয়াত্তুন আঁই তোঁয়ারে খেলাফত দি ফালাই, তুঁই যিয়ান খরদ্দে সঠিখ খরদ্দে। তোঁয়ার খতাই

সঠিখ। তুঁই তোঁয়ার মত খাম খর। ' (আমি আজই তোমাকে খেলাফত দিয়ে দিচ্ছি। তুমি যা করছ ঠিকই করছ। তোমার কথাই সঠিক। তুমি তোমার মতো কাজ করে যাও।)

হযরত রহ. দাওয়াতের কাজে ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরব, মিশর, মরক্কো, সুদান-সহ বহু রাষ্ট্রে সফর করেছেন।

আল্লাহর পথে মুজাহাদা

'৭১ এর স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় সংসারে অনেক অভাব থাকা সত্ত্বেও তাবলীগের কাজ ছাড়েননি। হযরত রহ. এর সহধর্মিণী বলেন, 'সংগ্রামের সময় তাঁর হাতে টাকা ছিল না। বাড়ি থেকে জামা'আতে যাওয়ার সময় আলু আর কাঁঠালের বিচি নিয়ে গিয়েছিলেন। দুটি কাঁঠালের বিচি দিয়ে সাহরী খেতেন দুটি দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি অর্থসংকটের কারণে জামা'আতের লোকদের সাথে খানায় শরিক হতেন না। আমীর সাহেবকে বলে দিয়েছিলেন, আমার খানার ব্যবস্থা আছে। অন্যরা খানা খেত আর তিনি না খেয়ে থাকতেন। অভাবের কারণে হাতের ছাতাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। '

ফেনী জামিয়া মাদানিয়ার নায়েবে মুহতামিম ও প্রধান মুফতী আহমদুল্লাহ কাসেমী দা.বা. বলেন, 'তা'লীম, তাবলীগ ইত্যাদি বিষয়ে মুফতী আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন অত্যন্ত মু'তাদিল (মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী)। কখনো ইফরাত-তাফরীত (বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি) পছন্দ করতেন না। রমাযানে তালিবুল ইলমদের তাবলীগে যাওয়ার জন্য তাশকীল করতেন। যদি কোনো ছাত্রের ব্যাপারে জানতেন যে, সে উস্তাদের নেগরানীতে রমাযানের সময়টুকু মুতালাআয় কাটাবে তাহলে তাকে তাবলীগের জন্য তাশকীল করতেন না। বরং তাকে মাদরাসায় থাকার পরামর্শ দিতেন এবং তাবলীগে যেতে নিষেধ করতেন। '

তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি। অহংকার বা গর্ব কী জিনিস তা তিনি জানতেন না। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে তিনি আজীবন সাধনায় রত ছিলেন। তাকওয়ার প্রভাবেই শত্রু-মিত্র সবাই তাঁকে সমীহ করত। দূর থেকে যতই বাঁকাচোখে দেখুক, তাঁর সামনে দাঁড়ালে শত্রু-মিত্র সকলেই শ্রদ্ধায় বিগলিত হতো। শাইখুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী রহ. বলেন, 'মুফতী আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন আবদিয়্যাতের মূর্তপ্রতীক। '

ইন্তেকাল

লাকসামের হুযূর রহ. ২৭ যিলহজ্জ ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৮ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইনতেকাল করেন। ইনতেকালের দিন সারাক্ষণই জোরে জোরে কালিমায়ে তায়্যিবার যিকির করেছিলেন। ইশার নামাযের সময় তিনি ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করেন। নামায শেষে ফের উচ্চস্বরে যিকির করতে থাকেন। তারপর ক্ষণজন্মা এই মহান মনীষী রাত ৮টা ৩০ মিনিটে কালিমা পড়তে পড়তে পরলোকগমন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। পরদিন শুক্রবার বেলা ১১টায় তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি প্রেমনল আযীযনগর হেমায়েতে ইসলাম মাদরাসা সংলগ্ন মাকবারায়ে আযীযীতে সমাহিত হন। জানাযার ইমামতি করেন তাঁরই সুযোগ্য সাহেবজাদা, ঢাকা মতিঝিল পীরজঙ্গি মাদরাসার শাইখুল হাদীস, জাতীয় তাফসীর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সভাপতি মাও. আব্দুল আখির সাহেব দা.বা.।

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے،

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔

তাঁর সমাধিতে আকাশ যেন শিশির বর্ষণ করে / সবুজের আবরণ যেন সদা সেই ঘরকে স্নিগ্ধ রাখে।

আমীন।

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক, জামি'আ কাসিমুল উলূম, মিরপুর-১১, ঢাকা

(৮ পৃষ্ঠার পর : সালানা ইমতিহান...)

(আমলওয়ালা) হতে হবে। নিজের আমলটাই যেন একটা দাওয়াত হয়। কারণ যদি নিজেই আমল না করে তাহলে শুধু নসীহত করে পরিবারে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না এবং নিজের যথাযোগ্য অবস্থানও তৈরি করতে পারবে না। আর সে নিজে যদি আমল দেখাতে পারে তাহলে কম বললেও ফায়দা অনেক হবে। এজন্য নিজেকে আমলদার বানানো খুবই জরুরী।

রাবেতা : রমাযানের পূর্বে ও রমাযানে তালিবে ইলমদের জন্য বিভিন্ন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব কোর্স সম্পর্কে মৌলিকভাবে আপনার মূল্যায়ন কী?

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : এক্ষেত্রে কোনো ছাত্র তার তা'লীমী মুরুব্বী (শিক্ষা বিষয়ক অভিভাবক) বা মুশীরের (পরামর্শক) কথার বাইরে যাবে না। বাইরে গেলে ক্ষতি আছে। তিনি মাশওয়ারা দিলে করবে এবং তিনি যেখানে কোর্স করার পরামর্শ দেন সেখানে করবে। আর তিনি যদি বলেন প্রয়োজন নেই তাহলে করবে না।

রাবেতা : রমাযানের বিরতি অতিবাহিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরো কোন দিকনির্দেশনা আপনার যেহেনে থাকলে তাও কামনা করছি।

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : প্রত্যেক বছরের রমাযানেই আগের বছরের রমাযানের তুলনায় আমলের দিক থেকে অধিক অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে। এমন যেন না হয় যে, এবারের রমাযানও আগের রমাযানের মতই কাটছে। ঐ হাদীসের উপর যেন আমল হয় যেখানে বলা হয়েছে,

من طال عمره وحسن عمله...

'একব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? নবীজী বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? নবীজী বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল মন্দ হয়েছে। ' (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৩৩০)

সুতরাং এই হাদীসের ফযীলতের ভাগীদার হওয়ার জন্য প্রত্যেক বছরের রমাযানকেই আগের বছরের রমাযানের তুলনায় আমলের দিক থেকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করবে।

রাবেতা : জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. : ওয়া ইয়্যাকুম। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাক্ষাতকার গ্রহণ : মাওলানা ইরফান জিয়া মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.-এর সঙ্গে

একটি সফর ও কিছু শিক্ষা

আব্দুর রহীম সিরাজী

হযরত মুফতী সাহেব হুযূর দা.বা. স্বীয় শাইখ মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ.-এর রেখে যাওয়া আমানত 'দাওয়াতুল হক'-এর কাজে সারা বছর নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিশেষ করে মাদরাসার সবক বন্ধকালীন জেলাভিত্তিক সফর করে থাকেন। ২০১৭ সালের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ছুটিতে রাহমানিয়ার কিছু তালিবে ইলমের উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও জেলায় পাঁচ দিনের একটি সফরের আয়োজন করা হয়।

সফরসঙ্গী হওয়ার খোশনসীব

বড়দের সঙ্গে সফর করার সুযোগ পাওয়া বড়ই খোশনসীবের বিষয়। এতে একদিকে যেমন সরাসরি তাদের সোহবত লাভ হয়, অপরদিকে এমন কিছু বিষয় হাসিল হয় যা স্বাভাবিক দরস-তাদরীসে হয় না। ২০১৭ ও ২০১৮ ঈসায়ীর দু'টি বছর হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের খিদমতে অধমের থাকার সুযোগ হয়েছে। সে সুবাদে নিজের সীমাহীন অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই দুই বছর হযরতের সঙ্গে আমার প্রায় শতাধিক সফর করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রতিটি সফরেই শেখার বহু কিছু ছিল; কিন্তু অযোগ্য আমি কিছুই শিখতে পারিনি। তবে ছিটেফোঁটা যা কিছু মনে আছে সেগুলোই আমার পথের পুঁজি, জীবনের পাথেয়।

২৮ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ১লা ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পাঁচদিনের এই সফরে অনেকেই অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো। পনেরো জনের নাম লেখা হয়েছিল। সফরসঙ্গী ও পুরো সফরের দু'টি তালিকা হযরতের সামনে পেশ করা হলো। হযরত সেখান থেকে আটজনকে নির্বাচন করলেন। হযরত মুফতী সাহেব হুযূর দা.বা., মুফতী ইবরাহীম হিলাল সাহেব দা.বা. (নায়েব সাহেব হুযূর), মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব (মুহতামিম ওয়াশপুর মাদরাসা) এবং আরও চারজন তালিবে ইলমসহ আমিও হযরতের খিদমতে থাকার সুযোগ পেলাম।

সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের মধ্য থেকে তিন সাথী ২৭ তারিখ দিবাগত রাতে বাসযোগে দিনাজপুরের ফায়েলে রাহমানিয়া মাওলানা আব্দুল হাই ভাইয়ের মাদরাসায় হযরতদের জন্য ইনতিযার করবে। আর হযরতসহ বাকী পাঁচজন ২৮ তারিখ সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিমানযোগে সেখানে পৌঁছবেন। হযরত সবাইকে আগেই সফরের প্রয়োজনীয় সামানপত্রের তালিকা করে সেই অনুযায়ী লাগেজ গোছানোর নির্দেশ দিলেন।

সফরে প্রথম দিন

আলহামদুলিল্লাহ, হযরতসহ সবাই সিহ্হত ও আফিয়াতের সাথে যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলো। দুপুর বারোটা থেকে মূল প্রোগ্রাম শুরু হবে। এর আগ পর্যন্ত নাস্তা ও বিশ্রাম। এই পাঁচ দিনের জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছিল। হযরত গাড়িতে প্রত্যেকের আসন নির্ধারণ করে দিলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, আমাদের মুরব্বীরা কী পরিমাণ উসূল ও নেযাম-পাবন্দ! মনে পড়ে গেল, হযরত মুফতী সাহেব ও মুমিনপুরী হুযূরের মুখে শোনা হযরত হারদুঈ রহ.-এর উসূল ও নেযামুল আওকাত পাবন্দীর ঘটনাগুলো। আসলেই আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থেকে কিছু শিখলে তার উপর আমল করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

বারোটার দিকে সাওতুল কুরআন মাদরাসার উদ্দেশে হযরত গাড়িতে উঠলেন। চালক রাজু ভাইকে দু'আ-দুরূদ পড়ে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালাতে নিষেধ করলেন। সোয়া একটা পর্যন্ত সাওতুল কুরআন মাদরাসায় আগত দিনাজপুরের উলামায়ে কেরামের সামনে নবীওয়ালা চার দায়িত্বের (দাওয়াত, তাযকিয়া, তা'লীমে কুরআন, তা'লীমে সুন্নাহ) গুরুত্ব তুলে ধরলেন।

পরবর্তী প্রোগ্রাম দিনাজপুর নিউটাউন মাদরাসায়। দু'টার দিকে সেখানে পৌঁছে গেলাম। দুপুরের খাবার শেষে চারটা পর্যন্ত হযরত ছাত্রদের উদ্দেশে বয়ান করলেন। বয়ানে হযরত ছাত্রদেরকে নবীওয়ালা চারগুণ অর্জনের বিশেষ তাকীদ দিলেন এবং ইলম অর্জনের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিলেন। ছাত্রদের হাতে মোবাইল-ফোন একটি ধ্বংসাত্মক বস্তু বলে আখ্যায়িত করলেন।

আজকে রাতের প্রোগ্রাম শেতাবগঞ্জ মাদরাসায়। হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের আগমনে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিরাট মাহফিলের আয়োজন করেছেন। হযরত নায়েব সাহেব দা.বা. ও মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব হযরতের আদেশে আসরের নামায আদায় করে শেতাবগঞ্জ চলে গেলেন। হযরত মুফতী সাহেব হুযূর সেখানে উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সুন্নাতের বয়ান করতে থাকবেন। হযরতসহ বাকী সাথীরা এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে রাত ৯টায় শেতাবগঞ্জ মাদরাসায় পৌঁছলেন। হযরত মাদরাসার মসজিদে আরাম করছিলেন। ছোট্ট এক তালিবে ইলমকে খুব তৎপরতার সাথে কাজ করতে দেখা গেলো যেন অভিজ্ঞ একজন দায়িত্বশীল। একদিকে সে হযরতের জন্য উযূর পানি গরম করছে, অপরদিকে নাস্তার ইনতিযাম করছে, আবার নামাযের ব্যবস্থা করছে। মনে কৌতুহল জাগলো। কে এই তালিবে ইলম? কোন মাদরাসায় পড়ে সে? তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী নাম তোমার? কোথায় পড়ো? বলল, মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. ও মুমিনপুরী হুযূরের মাদরাসা জামি'আ রাহমানিয়ায় ইবতেদায়ী আউয়ালে পড়ি। তোমার বাড়ি কোথায়? বলল পাশের এলাকায়। মনে পড়ে গেলো হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের সেই অমীয় বাণী– 'রাহমানিয়া থেকে আমীর তৈরী করা হয়, কর্মী নয়'। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর শাইখাইনের ছায়া দীর্ঘ করুন। অতঃপর হযরত মুফতী সাহেব হুযূর সাড়ে দশটা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত জনসাধারণের উদ্দেশে ঈমান-আমল ঠিক করে জান্নাত লাভের সহজ পথনির্দেশনা বাতলে দিয়ে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল শেষ করলেন।

একটি ঘটনা

শেতাবগঞ্জের বয়ানে প্রসঙ্গক্রমে হযরত বললেন, আমাদের শাইখ ও পীর মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদুঈ রহ. ওয়ায-মাহফিল করে বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন। হ্যাঁ, গাড়ি ভাড়া বা পথখরচের কথা ভিন্ন। আলহামদুলিল্লাহ,

আজ পর্যন্ত তাঁর কথার উপর আমল করার তাওফীক হচ্ছে। মাহফিল শেষে হযরত কামরায় আসলেন। তখন একব্যক্তি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলো। তিনি দু'আ নিয়ে চলে যাওয়ার সময় হযরতকে কিছু টাকা হাদিয়া পেশ করলেন। আগত লোকটি এই এলাকারও নয় এবং আজকের মাহফিলের সঙ্গেও তার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে হযরতের কাছে দু'আ নিতে এসেছেন। যারা আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন আল্লাহর রহমতও সদা-সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকে। হযরতের সঙ্গে এমন ঘটনা নতুন নয়। তিন বছর আগেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিলো। হযরত একই দিনে দু'টি মাহফিলে বয়ান করেছিলেন। বিনিময় তো এমনিই নেন না, সেদিন পথখরচও নেননি। মাদরাসা থেকে দরস শেষ করে বাসায় ফিরে দেখেন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তি হযরতের জন্য হাদিয়া-তোহফা নিয়ে অপেক্ষা করছে। পরের দিন হযরত আমাদেরকে দরসে বললেন, 'দেখো, বান্দা যখন আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে পেশ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মাখলুককে তার খিদমতে লাগিয়ে দেন। গতকাল আমি দু'টি মাহফিলে বয়ান করেছি। হাদিয়া পথখরচ কিছুই নেইনি। বাসায় গিয়ে দেখি, আল্লাহর দুই বান্দা হাদিয়া-তোহফা নিয়ে উপস্থিত। তারা দু'জন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে। হযরত বলেন, আমার প্রশ্ন হলো, দু'জন এলো কেন? একজন আসতো কিংবা তিনজন আসতো!'

আজকের রাত্রিযাপন এক দ্বীনদার হাজী সাহেবের বাসায় হলো। খাবার শেষে তিনি হযরতের নিকট খুশী প্রকাশ করলেন এবং আগামীকালের দাওয়াত কবুলের আবেদন করলেন। হযরত তাকে সামনের প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ করে ওযর পেশ করত তার জন্য দু'আ করলেন। তিনি হযরতের সাথে মুসাফাহা করে পাশের এলাকায় তার আরেক বাড়িতে চলে গেলেন। হযরতের জন্য যে কামরাটি নির্বাচন করা হয়েছিল তাতে খাট ছিল একটি। হযরত মিসওয়াক করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। হযরতের হাত-পায়ে যাইতুন মালিশ করছি আর মনে মনে ভাবছি, খাট তো একটা, আমি কোথায় ঘুমাবো? মিনিট বিশেক পর হযরত বললেন, তুমি আমার বাম পাশে শুয়ে পড়ো। হযরতের সেই স্বভাবজাত পিতৃসুলভ আচরণ আজো মনে পড়ে।

সফরের দ্বিতীয় দিন

পরের দিন সকাল দশটায় ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। দুপুর বারোটা থেকে জামি'আ ইবরাহীমিয়া গোয়ালপাড়া মাদরাসায় উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বয়ান করার কথা। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। সোয়া একটা পর্যন্ত হযরত বয়ান করলেন। বয়ান শেষে উযূ-ইস্তিঞ্জার জন্য মেহমানখানায় গেলেন। হযরত বাইতুল খালা (টয়লেট) থেকে বের হয়ে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, দেখ তো, এই টয়লেটে কী কী সমস্যা আছে? মাওলানা জামালুদ্দীন ভাই বললেন (এক) টয়লেট বড় হওয়ার কারণে মধ্যখানে একটা পর্দা দেওয়ার দরকার ছিল। (দুই) সাধারণ কমোড ও হাইকমোড মুখোমুখি হয়েছে। নায়েব সাহেব হুযূর তৃতীয় আরেকটি বললেন। এরপর হযরত মুফতী সাহেব হুযূর আরো কয়েকটি বললেন, (চার) সাবান রাখার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সাবান নেই। (পাঁচ) উযূ ও শৌচকার্যের বদনা একই রংয়ের। (ছয়) বালতি আছে কিন্তু মগ নেই। (সাত) পর্দা না থাকলে তো উযূর মধ্যে কিছু দু'আ আছে সেগুলো সেখানে পড়া যাবে না ইত্যাদি। তারপর মাদরাসার মুহতামিম সাহেবকে ডেকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলেন। তিনি হযরতের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং 'পরিদর্শন ডায়েরীতে' মাদরাসার ব্যাপারে হযরতের মন্তব্য লিখিয়ে নিলেন। আল্লাহু আকবার! এই হলো আমাদের মুরুব্বীদের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা আর রুচিবোধ। স্বীয় শাইখ থেকে যা যা পেয়েছেন সব কিছুই উম্মতের মাঝে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন।

একবার খাবারের মজলিসে আমি বাম হাত দিয়ে হযরতের প্লেটে খাবার দিচ্ছিলাম। এটা দেখে হযরত বলে উঠলেন, এই তুমি এটা কী করছো? আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, কী ভুল হয়েছে? কারণ, হযরতের সঙ্গে আমিও খাচ্ছিলাম। তখন হযরত বললেন, এখানে তোমার কয়েকটি ভুল হয়েছে- (১) খাবার আল্লাহর বড় একটি নিয়ামত। তাই আঙ্গুল চেটে হলেও ডান হাত ব্যবহার করা উচিৎ। (২) নিয়ম হলো খাবার মেহমানের সামনে রেখে দেওয়া, মেহমান তার রুচিমত নিয়ে খাবে। আমাদের শাইখ হারদুঈ রহ. বলতেন,

طعام اور قیام کے بارے میں اصرار مت کرو

অর্থাৎ খাওয়া ও থাকার ব্যাপারে কাউকে চাপাচাপি করা উচিত নয়। হযরতের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, বাম দিক থেকে খানা পরিবেশন করাও খানার সঙ্গে একধরণের বেয়াদবী।

বিকাল তিনটায় আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম আজকের রাতের মাহফিলের উদ্দেশ্যে। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, ঠাকুরগাঁওয়ে দু'দিন থাকতে হবে এবং এই দু'দিন ঢাকার মেহমানরা আবাসিক হোটেলে থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আসরের নামাযের আগেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম। আল-আমীন হোটেলের তিনতলায় ৪০৫ নম্বর রুমে হযরত ও আমি আর ৪০৯ নম্বর রুমে নায়েব সাহেব হুযূর ও মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব। সিদ্ধান্ত হলো, ইশার আগ পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া হবে, তারপর বাইতুন নাজাত মসজিদ ও মাদরাসার উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে জনসাধারণের উদ্দেশে হযরতের বয়ান।

এখানে আমরা একটি বে-উসূলী করে ফেললাম। তা হলো, হোটেল থেকে বাইতুন নাজাত মসজিদ ও মাদরাসা পশ্চিম দিকে। আমরা হযরতকে না জানিয়েই উল্টো পথে একটি মাদরাসায় প্রোগ্রাম নিয়েছি। হযরত জানতে পেরে আমাদের প্রতি নারায হলেন। আমরা সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। হযরত আমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আমাদের ইসলাহের জন্য বললেন যে, খোদরায়ী তথা নিজেদের বুঝমতো কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না। যা হোক, আমরা ঐ মাদরাসায় ইশার নামায আদায় করলাম। নামাযের পর হযরত ছাত্রদের থেকে আযান-ইকামত, তিলাওয়াত শুনে ভুলগুলো মশকের মাধ্যমে ঠিক করে দিলেন। মুহতামিম সাহেব কিছু হাদিয়া পেশ করলে হযরত তা নিলেন না; বরং মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে কিছু টাকা দিয়ে নিজ হাতে রশিদ নিলেন। হযরতের মুখে বহুবার শুনেছি, অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের কাছে মাদরাসার জন্য টাকা দিয়ে বলে, হুযূর রশিদ লাগবে না। আমি তখন বলি, আপনার লাগবে না, ঠিক আছে, কিন্তু আমার লাগবে। অর্থাৎ আমি যেন হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছ থাকি; আমার অজান্তে যেন মাদরাসার কানাকড়িও ব্যক্তিগত কাজে খরচ না হয়ে যায়।

এরপর রওয়ানা হলাম মাহফিলের দিকে। মাহফিল কর্তৃপক্ষের একজন জানালেন, এই এলাকার অর্ধেক লোক আহলে হাদীস, তাই হযরত যেন এ ব্যাপারে কোন কথা না বলেন। কিন্তু হযরত বয়ানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আহলে হাদীসদের সব গোঁমর ফাঁস করে দিলেন এবং তাদেরকে দলীলভিত্তিক জবাব

দিলেন। আসলে আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে তো আল্লাহ তা'আলা কথা ঢালতে থাকেন, তাদের মুখটি তখন মাইকের কাজ দেয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার ফযলে তাদের উপর হযরতের বয়ানের ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পরে খবর এলো, তারা বলাবলি করছে যে, হুযূর তো আমাদেরকে শুইয়ে দিয়ে গেলেন।

রাত বারোটায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়লাম। মোবাইলের লাইটের আলোতে কিছু লিখছিলাম। একটু পর হযরত বললেন, সারাদিন তো ঘুমানোর সুযোগ পাওনি, এখন ঘুমিয়ে নাও।

ফজরের পরে হযরত নিজে নায়েব সাহেব দা.বা. ও মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেবকে ডেকে এনে একসঙ্গে হালকা নাশতা করলেন এবং বললেন, আমরা সবাই এখন বিশ্রাম নেবো এবং দশটার দিকে উঠে পরবর্তী সফরের প্রস্তুতি নেবো। সে অনুযায়ী দশটার দিকে উঠে হযরতের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করা হলো। হযরত গোসল করে হযরত পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, তুমি তৈরী হয়ে নাও। এভাবেই হযরত পুরো সফরে প্রত্যেক সাথীর প্রতি খুব খেয়াল করেছেন।

সফরের তৃতীয় দিন

৩০ অক্টোবর ২০১৭, সোমবার। সফরের তৃতীয় দিন। আজকের সফর ঠাকুরগাঁও জেলার নেকমরদ থানায়। নেকমরদ এক আল্লাহওয়ালার উপাধী। অর্থ হচ্ছে ভালো মানুষ। তিনি ঐ এলাকার মুসলমানদেরকে দ্বীনের তা'লীম দিতেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামেই থানার নামকরণ করা হয়। লোকমুখে শোনা যায়, তাঁর আসল নাম ছিল নাসীরুদ্দীন অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী। এগারোটার দিকে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। চালক রাজু ভাই দু'আ-দুরূদ পড়ে গাড়ি চালু করলেন। গাড়ি চলতে লাগল গন্তব্যের দিকে। যোহরের পরে এক মাদরাসায় হযরত একঘণ্টা বয়ান করলেন এবং একজন তালিবে ইলমকে হিফযের প্রথম সবক দিলেন। বাদ ইশা হযরত জনসাধারণের উদ্দেশে বয়ান করেন।

এই অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থা খুবই নাযুক। অল্প কিছু টাকা-পয়সার বিনিময়ে তারা নিজেদের ঈমান বিক্রি করছে। মুসলমান সন্তানরা এনজিওদের স্কুলে লেখা-পড়া করে। মহিলাদের পর্দা-পুশিদার কোন খবর নেই বরং যুবতী, বৃদ্ধা নির্বিশেষে সবাই সাইকেল, মোটরবাইক ইত্যাদি চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করছে। অবস্থা দেখে হযরত আফসোস করছিলেন। আমরা হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, এর থেকে উত্তরণের পথ কী? হযরত বললেন– (এক) ঢাকার উলামায়ে কেরামের এই অঞ্চলে এসে মুসলমানদেরকে ঈমানের গুরুত্ব বোঝানো। (দুই) বেশি বেশি মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। (তিন) এই অঞ্চলের সন্তানদেরকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে যোগ্য আলেম বানানো। (চার) ঢাকার মাদরাসাগুলোর ফারেগীনদের মন তৈরী করে এই অঞ্চলে খেদমতে পাঠানো।

খাবার শেষ করে হাবীবুল্লাহদের বাসা থেকে রওনা করলাম আল-আমীন হোটেলের উদ্দেশে। তখন রাত একটা বাজে। খোলা আকাশের নিচে নীরব-নিস্তব্ধ পথে শুধু আমাদের গাড়িটা চলছে। দোকান-পাট বন্ধ। সামনে কোন দোকান খোলা পেলে গাড়ি থামাতে হযরত নির্দেশ দিলেন। এত রাতে কেন এই নির্দেশ? আমরা চমকে গেলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। এই রাতে কে দোকান খোলা রাখবে? আর আমাদের প্রয়োজনটাই বা কী? কিছুক্ষণ পরে একবাজারে একটি ভ্যারাইটিজ স্টোর খোলা পাওয়া গেল। গাড়ি থামানো হলো। হযরত বললেন, একজন নেমে যাও; কিছু কলা, বিস্কুট, পাউরুটি নিয়ে আসো, যাতে সকাল বেলা বেরোনোর আগে আলাদা করে সময় না হলেও হালকা ক্ষুধা নিবারণ করা যায়। এবার বুঝে আসলো, হযরত কেন আমাদের গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কী পরিমাণ দূরদর্শী হলে এভাবে সাথীদের খেয়াল করেন। রাত দুইটায় পৌঁছলাম। আগামীকাল সকালে যেহেতু আমরা ঠাকুরগাঁও ত্যাগ করবো, তাই কিছু সামানপত্র গুছিয়ে রেখে ঘুমিয়ে গেলাম।

সফরের চতুর্থ দিন

৩১ অক্টোবর ২০১৭, রোজ মঙ্গলবার। আজকে আমাদের সফর পঞ্চগড় হয়ে লালমনিরহাট। মাওলানা সাজিদুর রহমান ভাইদের বাসা থেকে নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে দশটায় আবার সফর শুরু হলো। আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ি ছুটে চলছে। এই পথটি অনেকেরই অচেনা। ফলে গাড়ি পূর্ব দিকে চলছে নাকি দক্ষিণ দিকে ঠাহর করতে পারছিলাম না। হযরত বললেন, কিছুক্ষণ পূর্ব দিকে চলবে তারপর উত্তর দিকে চলতে থাকবে। হযরত একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম হযরতের কথাই ঠিক হলো। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে ঈর্ষান্বিত মেধা দান করেছেন। দরসে বহু শাখাবিশিষ্ট মাসআলাগুলো এতো সুন্দর নকশা করে বোঝান যে, একদম দুর্বল ছাত্রও সহজে বুঝতে পারে। সাড়ে বারোটার দিকে একটি ছোট মাদরাসা পরিদর্শনের জন্য যাত্রাবিরতি দেয়া হলো। হযরত সংক্ষেপে কয়েকটি নসীহত করে দু'আ করে দিলেন। আবার যাত্রা শুরু। দেড়টার দিকে পঞ্চগড়ের একটি মাদরাসায় পৌঁছলাম। মাদরাসাটি আনুমানিক ১৯৭২ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মাদরাসাটি আল্লামা মাহমূদুল হাসান (যাত্রাবাড়ীর হযরত)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দারে মাহমূদের নিচতলায় আমরা নামায পড়লাম। তারপর হযরত ঘণ্টাখানেক বয়ান করলেন। দুপুরের খাবার খেয়ে আউয়াল ওয়াক্তে আসরের নামায পড়ে আমরা লালমনিরহাটের উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। হযরত বললেন, ঘণ্টাখানেক পরই পথে তিস্তা ব্যারেজ পড়বে। এই ফাঁকে আমরা নায়েব সাহেব হুযূরের নিকট এই সফরের কিছু অনুভূতি ব্যক্ত করার দরখাস্ত করলাম। হুযুর তিনটি অনুভূতি ব্যক্ত করলেন। (১) হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের মত মুখলিস, দুনিয়া বিমুখ বুযুর্গের সোহবতে থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। (২) এই অঞ্চলের মুসলমানদের ঈমান-আমলের জন্য আমাদের বিশেষ মেহনত করা দরকার। (৩) এখানে মোমেনশাহীর অনেক মানুষ পেয়েছি, যাদের সঙ্গে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হয়েছে। এতে আমি ভীষণ প্রীত হলাম।

ইতোমধ্যে আমাদের গাড়ি তিস্তা ব্যারেজের উপর চলে আসলো। হযরত বললেন, এই সেই তিস্তা ব্যারেজ, যাও, সবাই নেমে দেখে আসো। বেশ কিছুক্ষণ আগে মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। নায়েব সাহেব হুযূর মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে আমাদের পুরোটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তিস্তা ব্যারেজটি খুবই নৈপুণ্যের সাথে তৈরী করা হয়েছে। এখান থেকে বাংলাদেশ বর্ডারগার্ড ও ভারতীয় বিএসএফের ক্যাম্পের লাইটগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আবার যাত্রা শুরু হলো। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কে কেমন দেখেছো? হযরত আমাদের আনন্দের প্রতি যারপরনাই খেয়াল করতেন !

রাত আটটায় লালমনিরহাট জামি'আতুল আবরার মাদরাসায় পৌঁছলাম। হযরত খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর বয়ান শুরু হলো। সাড়ে

বারোটার দিকে বয়ান শেষ করে হযরত আখেরী মুনাজাত করলেন। হযরতের নির্দেশে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। এ সফরে হযরতের সঙ্গে তিনটি রাত কাটিয়েছি। সারাদিন সফর তারপর দৈনিক তিন চারটা প্রোগ্রাম করে রাত একটা বা দুইটা যখনই ঘুমাতেন ফজরের আযানের আগেই উঠে যেতেন। আর আমাদের ঘুমের প্রতি খেয়াল করে আস্তে আস্তে দরদমাখা কণ্ঠে নাম ধরে ডাকতেন।

সফরে শেষ দিন

১ নভেম্বর ২০১৭, রোজ মঙ্গলবার। আজ ইনশাআল্লাহ ঢাকায় ফিরব। ইশরাকের পর থেকে আটটা পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর এখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে জামিরবাড়ি এলাকায় হযরতের মাদারাসায় প্রোগ্রাম। একজন দ্বীনদার ব্যক্তি কিছু জায়গা মাদারাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরতকে দিয়েছেন। বর্তমানে মাদরাসাটির জায়গা বাইশ বিঘা। আনুমানিক ষোলো বছর পূর্বে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার কয়েক বছর পর কিছু ইসলাম বিদ্বেষী মিথ্যা প্রচারণা করে মাদরাসাটি বন্ধ করে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ এ বছর থেকে নতুনভাবে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকাল ন'টার দিকে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। তারপর এলাকাবাসীর সাথে বৈঠক করে নতুন কমিটি গঠন করে দেয়া হলো। মাদরাসাটি নিয়ে হযরতসহ এলাকাবাসী অনেক স্বপ্ন লালন করে আসছেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের একজন ছাত্র ইতোমধ্যে দাওরা হাদীস শেষ করে অন্য মাদরাসায় খিদমতে আছে। এখানে সাড়ে দশটা পর্যন্ত গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে বৈঠক করে সর্বশেষ তাদের উদ্দেশে হযরত তিনটি কথা বললেন- (১) এই মাদরাসাটি এলাকার প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের। তাই প্রত্যেকে মনে করবেন এটা আপনার মাদরাসা। (২) সবাই মাদরাসার 'আজীবন সদস্য' হয়ে মাদরাসাটি চালু রাখবেন। (৩) পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকবেন। একে অপরের সহযোগিতা করবেন।

ফিরতি পথে

এবার ঢাকা ফেরার পালা। সোয়া একটার পর সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ফ্লাইট। সাড়ে এগারোটায় লালমনিরহাট থেকে বের হলাম। সৈয়দপুর পৌঁছতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। আমরা ভীষণ চিন্তিত। কিভাবে সেখানে পৌঁছব? হযরত সবাইকে দু'আ-দুরূদ পড়ে নিতে বললেন। আমাদের গাড়ি বেশ গতিতে চলছে। সৈয়দপুর যাওয়ার দু'টি রাস্তা। একটি পুরাতন, অপরটি নতুন। কাজ প্রায় শেষের দিকে কিন্তু এখনো উদ্বোধন করা হয়নি। যদি পুরাতন রাস্তা ধরে গাড়ি চালানো হয় তাহলে সময়মতো সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়। ঐ এলাকার একজন মন্ত্রী হযরতকে খুব মুহাব্বাত করেন। তিনি লালমনিরহাটে হযরতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দু'টি মাদরাসার সভাপতি। তার এক চাচাতো ভাই মুহতারাম যিকরুল হাসান সাহেব হুযূরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। মন্ত্রী সাহেব হযরতের খবর পেয়ে আগেই নতুন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন। তাই নতুন পথে যাওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেলো। আসলে মানুষের মন তো আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা'আলাই এইসব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সৈয়দপুর পৌঁছার ত্রিশ মিনিট আগে আমাদের গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় ছয়বার বন্ধ হয়ে যায়। আমরা পেরেশান হয়ে বলাবলি শুরু করলাম এখন কী হবে? কি করা যায়? ইত্যাদি। আমাদের অবস্থা দেখে হযরত একটু নারায হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'ইয়া সুব্বুহু! ইয়া কুদ্দুসু'-এর আমল করতে থাকো। আসলে আল্লাহওয়ালারা বিপদ দেখে পেরেশান হন না। আলহামদুলিল্লাহ, কিছুক্ষণ পরে গাড়ি ঠিক হয়ে গেলো। সোয়া একটার দিকে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম।

কয়েক মিনিট পর বিমান উড়তে লাগল। হযরত মুফতী সাহেব হুযূর ও ডা. মাওলানা রিযওয়ানুল হাসান ভাই একসঙ্গে পাশাপাশি সিটে বসলেন আর নায়েব সাহেব হুযূর ও আমি একসঙ্গে বসলাম। নায়েব সাহেব হুযূর নিজ হাতে আমার কোমরে সিটবেল্ট বেঁধে দিলেন। মনে হলো, আমি আমার পিতার পাশেই বসেছি। জীবনের প্রথম আমি বিমানে সফর করছি। তাই একটু ভয়ও লাগছে। কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে নিলাম এবং মনে মনে আল্লাহর দরবারে তিনটি আর্জি পেশ করলাম। (১) হে আল্লাহ! আমাকে বারবার মক্কা-মদ্বীনা যিয়ারতের তাওফীক দিন। (২) দ্বীনের কাজ নিয়ে সারা বিশ্বে সফর করার তাওফীক দিন। (৩) হযরত মুফতী সাহেব হুযূরসহ আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থাকার তাওফীক দিন।

ডা. মাওলানা রিযওয়ানুল হাসান ভাই এই সফরের যাবতীয় খরচের হিসেব হযরতের নিকট পেশ করলেন। খরচের পরও পাঁচ হাজার টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেগুলো পেশ করা হলে হযরত বললেন, তোমরা এই টাকাগুলো দিয়ে কিছু দ্বীনী কিতাবাদি কিনে এলাকার মসজিদে দিয়ে দিতে পারো। হযরত বিরতিহীন পাঁচদিন সফর করেছেন। প্রায় দশটি মাহফিল সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কোন মাহফিল থেকে একটি কানাকড়িও গ্রহণ করেননি। আমি বিস্মিত হলাম যে, একজন মানুষ এতোটা নির্মোহ কি করে হতে পারেন। আমি শুধু কায়মনোবাক্যে দু'আ করছিলাম– হে আল্লাহ! এ সকল মুখলিস বুযুর্গকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং আমাদেরকে তাদের মতো জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৪৭ পৃষ্ঠার পর : ফাতাওয়া মাসাইল

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

কুফর এর সংজ্ঞা হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও অস্বীকার করা। সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞার মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে সেটাই কুফরী হবে। তাই তা কোন সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং আপনার বর্ণিত প্রশ্ন অনুযায়ী ২, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নম্বর বিষয়গুলো সর্বাবস্থায় কুফরী নয়। বরং এগুলো কবীরা গুনাহ ও মারাত্মক অন্যায়। ক্ষেত্র বিশেষে কুফরও হতে পারে। তাই কোন ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কুফরীর কোন বিষয় পাওয়া গেলেই ঢালাওভাবে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং পূরিপূর্ণ ও স্পষ্ট যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে।

(সূরা নিসা; আয়াত ১১৬, আল-ফিকহুল আকবার; পৃষ্ঠা ১১৩, সূরা তাওবা; আয়াত ২৪, ৬৫, ৬৬, ফাতাওয়া শামী ১/৪৫, ৪/২২২, ২২৩, ২২৪, ২৪০, সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৮৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৪, সূরা সাজদাহ; আয়াত ২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮১, সূরা আহকাফ; আয়াত ২৮, সূরা ইউনুস; আয়াত ১৮, ইমদাদুল আহকাম ১/১৩০-১৩২, তাফসীরে তবারী ১৮/৫২, ২৩/৩১০, আহকামুল কুরআন ৫/৩২৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/১২৪, ৮/৮৪, সহীহ মুসলিম ১/৬২, ফাতাওয়া শামী ৪/২৪০, সহীহ বুখারী ১/১২, আত-তাম্বীহাতুল মুখতাসারা; পৃষ্ঠা ৩৮, শরহু মানযূমাতিল ঈমান; পৃষ্ঠা ১৪৯, ইকফারুফ মুলহিদ্বীন ফী জরুরিয়াতিদ্দীন; পৃষ্ঠা ৭)

মুসলিম দার্শনিকরা কি বিবর্তনবাদের আবিষ্কারক?

মাওলানা হুজাইফা মাহমুদ

বিগত দুই শতকের ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনে পৃথিবী মৌলিকভাবে দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমত উপনিবেশ-শাসিত দেশগুলোর ধন-সম্পদ, কাঁচামাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব লুট করে নিয়ে একদম ফতুর করে ছেড়ে দিয়েছে। এর পাশাপাশি দেশে দেশে লাখে লাখে মানুষ হত্যা করা হয়েছে নির্বিচারে। অন্যান্য জুলুম-নিপীড়ন তো আছেই।

দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ মেয়াদী যে ক্ষতিটি করেছে তা হলো, তারা এমন এক প্রভুভক্ত শ্রেণী তৈরী করে গেছে সব দেশে, যারা যুগযুগ ধরে তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের দাসানুদাস হয়ে থাকবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দেবে ঔপনিবেশিক চিন্তা ও চেতনার উত্তরাধিকার। নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে ফরাসিরা যখন মিসর দখল করে, তখন তারা নিজেদের উপনিবেশ রক্ষার জন্যই এমন একটি উলামা দল তৈরী করে, যারা তাদের হয়ে কথা বলবে। যেহেতু মিসরের মতো মুসলিম দেশে যেকোন আলেমের কথার মূল্য সকলের কাছেই প্রণিধানযোগ্য। এই প্রক্রিয়ার সুবিস্তারিত বিবরণ এডওয়ার্ড সাঈদের অরিয়েন্টালিজমে পাবেন।

ফরাসিরা প্রথমেই একদল আলেমকে ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্ট (আলোকায়ন)–এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই এনলাইটেনমেন্টের কল্যাণে ইউরোপ কিভাবে রাতারাতি পৃথিবীর মালিক বনে যায়, সেটা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়। সেই উলামা দলের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহু, জামালুদ্দীন আফগানী এবং তাদের অনুসারীদের বড় একটি দল। তারা মুসলিম জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদিতে এগিয়ে নিতে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইসলাম ও মুসলিম জাতির আধুনিকায়নের কথা বলেন, যে আধুনিকতার সর্বোচ্চ অর্থ হলো পশ্চিমা আলোকায়নের অন্ধ অনুকরণ। মোর মডার্নাইজেন মিনস মোর ওয়েস্টার্নাইজেশন।

ফলে ইসলামের গৌরবময় জ্ঞানচর্চা আর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার ইতিহাসে এমন এক বিপর্যয় ডেকে আনেন যার ক্ষতিপূরণ এখনও দিয়ে যেতে হচ্ছে। অপরদিকে একই ঘরানার লোক ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ প্রমুখগণ। তারা ইসলামকে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও আধুনিকতার অন্যান্য প্রপঞ্চগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এতোটাই মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন যে, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়াবলীর যে ইন্টেগ্রিটি (অকাট্য) আর প্রোফাউন্ডলি এস্টাবলিটি (সুসংহত ভিত্তিমূল) ছিলো সেগুলোতে একযোগে আঘাত করতে শুরু করেন। মিসরে ওইসব উলামারা যখন নবী রাসূলদের মু'জিযা, কারামত, জিন, জান্নাত, জাহান্নাম ও অন্যান্য বিষয়-আশয়কে অস্বীকার করতে লাগলেন, ভারতের এইসব উলামারাও একই সুরে তাল দিলেন। কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এমন অনেক বিষয়কে স্রেফ এই কারণে অস্বীকার করা শুরু করলেন যে, এগুলো আধুনিক (বলা ভালো ইউরোপের আলোকায়িত) বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়!

এরই ধারাবাহিকতায় বিবর্তনবাদের প্রশ্ন যখন সামনে আসলো, তখনও তারা কোন ধরণের বাছ-বিচার ছাড়াই একে সাদরে গ্রহণ করে নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। আফগানী এবং স্যার সৈয়দ উভয়েই স্বাগত জানিয়েছেন একে। দাবী করেছেন, ডারউইনের এই মতবাদের সাথে ইসলামের আকীদাগত ও চৈতন্যগত কোন বিরোধ নেই। এই দাবীর সপক্ষে দলীল প্রমাণ আর যুক্তি অনুসন্ধান করেছেন প্রাচীন ইসলামিক দার্শনিক ও যুক্তিবিদদের লেখাজোখায়। এবং খুব সহজেই মানুষকে বুঝাতে পেরেছেন, এই আবিষ্কার ডারউইনের নয়, তারও বহু আগে আমাদের মুসলিম দার্শনিকদের আবিষ্কার, সুতরাং বিরোধিতা করার কোন প্রশ্নই আসে না। তারা আগে দাবী করেছেন, তারপর যত্রতত্র দলীল প্রমাণ ও যুক্তির খোঁজে চষে বেড়িয়েছেন। বিবর্তনবাদের ইসলামীকরণে কতটা মরিয়া হয়েছিলেন তারা সেটা বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। জালালুদ্দীন আফগানী এক চিঠির জবাবে আবুল আলা মায়াররির মরমী ভাববাদী একটি কবিতার লাইন উল্লেখ করে দাবী করেন, এই কবিতায় বিবর্তনবাদের কথা বলা হয়েছে। আগের যুগে মুসলিম দার্শনিকরা বিবর্তনবাদ চর্চায় কতটা অগ্রসর ছিলেন, সেটা বুঝাতে চাইছেন তিনি। কবিতার মোটামুটি ভাবার্থটা ছিলো এমন– 'পৃথিবীর মানুষ ভেবে ভেবে হয়রান, মাটির ভেতর থেকে সৃষ্টি হবে নতুন প্রাণ।'

এই একটা মাত্র তথ্য, বক্তব্যের মিস ইন্টারপ্রিটেশন (মনগড়া ব্যাখ্যা), কতিপয় দার্শনিকের নাম, কিছু বইয়ের উদ্ধৃতি অভাবনীয় ও আশ্চর্য রকমের প্রভাব ফেলেছে ইউরোপের আলোকায়নে আলোকিত শিক্ষিত মুসলিম সমাজে। অতীব বিস্ময়ের সাথে আমরা দেখি, ডক্টর হামিদুল্লাহর মতো বিজ্ঞ আলেম, আল্লামা ইকবালের মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পর্যন্ত এই একই ফাঁদে পা দিয়েছেন। আলেম-উলামা থেকে শুরু করে শিক্ষিত জনসাধারণ পর্যন্ত গর্বের সাথে প্রচার করতে লাগলেন, এই তত্ত্ব আমাদের আবিষ্কার।

এর জ্বলন্ত উদাহরণ আপনি সহজেই দেখতে পাবেন ইন্টারনেটে। ইংরেজী এবং আরবীতে (অন্যান্য ভাষায়ও অবশ্যই আছে) অসংখ্য অগণিত বই, আর্টিকেল, রিসার্চ পেপার লিখিত হয়েছে, হচ্ছে এই বিষয়ে। কোন্ কোন্ মুসলিম দার্শনিক বিবর্তনবাদকে সমর্থন করেছেন, কার বক্তব্য আধুনিক বিবর্তনবাদের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, এ নিয়ে এক হুলুস্থুল কাণ্ড তৈরী হয়েছে। সেই উপনিবেশ আমল থেকে নিয়ে এই সময় পর্যন্ত কত বই আর আর্টিকেল লেখা হয়েছে এর কোন ইয়ত্তা নাই। আমি কিছুদিন এসব ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম। খুবই দুঃখিত আর হতাশ হয়েছি তখন। মানুষ এতোটা অন্ধ অনুকরণ করে? কোন প্রশ্ন নাই, সন্দেহ নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই, এতো সহজে ঈমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আপোষ করে বসে আছে, স্রেফ কিছু মানুষের কথার উপর ভিত্তি করে! এইসব 'গর্বিত মুসলিমদের' গর্ব আরও উস্কে দেয় বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, হাফিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস কিংবা নামি-দামি বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক জার্নালগুলো। তারাও ফলাও করে প্রচার করে, বিবর্তনবাদ মুসলিমদের আবিষ্কার!

কিন্তু, বাস্তবেই কি ডারউইনের পূর্বে কোন মুসলিম স্কলার, দার্শনিক বিবর্তনবাদের কথা বলে গিয়েছেন?

কারা বলেছেন, কী বলেছেন, তাদের কথার ইন্টারপ্রিটেশনের যথার্থতা কতটুকু? আমি আপাতত কিছুটা সংক্ষেপে এসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত বলতে গেলে সেটা এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বা বইয়ের দাবী রাখে, সে ধৈর্য এবং যোগ্যতা কোনটাই নেই আমার।

এক. সাধারণত যেসব মুসলিম দার্শনিকের নাম নেয়া হয় বিবর্তনবাদী হিসেবে, তারা হলেন জাহেয মিসকাওয়াইহ (৪৩১হি.) ইবনে খালদুন (৮০৮হি.), আল বেরুনী (১০৪৮ ঈসায়ী) এবং তৃতীয় শতাব্দীতে বসরায় গড়ে উঠা ইখওয়ানুস সাফা নামক দার্শনিকদের একটি গুপ্ত সংগঠন। এছাড়া একই ধারার আরও কয়েকজনের নাম নেয়া হয়।

এদের মাঝে একমাত্র জাহেয ব্যতীত অন্য সবার বক্তব্য কিছু শব্দ বাক্য ছাড়া প্রায় এক। অর্থাৎ, ইখওয়ানুস সাফার দার্শনিকরা যা বলেছেন, মিসকাওয়াইহ ও ইবনে খালদুনও ঠিক তাই বলেছেন। সর্বোপরি এটা তাদের নিজস্ব কোন চিন্তা বা দর্শন নয়। সুতরাং তাদের বক্তব্যের উৎস ও সূত্র যে এক, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে গ্রীক দর্শনে, নির্দিষ্ট করে বললে প্লেটো, এরিস্টটল ও প্লাটিনাসের দর্শনে।

একথা সর্বজনবিদিত, হিজরী তৃতীয় শতকে আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে গ্রীক দর্শন প্রবলভাবে প্রবেশ করে ইসলামী জ্ঞান ও দর্শন চর্চায়। ইসলামী দর্শন চর্চাকে গ্রীক দর্শন এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যে, অনেক সময় উভয়ের মাঝে পার্থক্য করাই মুশকিল হয়ে যেতো। আল্লামা নাসাফীর ভাষ্য অনুযায়ী, ইসলামী দর্শনে যদি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি না থাকতো, তাহলে সেটা গ্রীক দর্শন, না ইসলামী দর্শন বুঝা যেতো না। মোটকথা, গ্রীকদের দর্শন, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য বই আরবীতে অনূদিত হতে থাকে। ইখওয়ানুস সাফা নামক যে দার্শনিকদের গুপ্ত সংগঠনটি, তারাও মূলত গ্রীক দর্শনের চর্চাই করতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, দর্শন ও ধর্মের মেলবন্ধন ঘটানো।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল ও প্লাটিনাস এই তিনজনের সমন্বিত চিন্তায় জগতের সমস্ত সৃষ্টিকুলকে তাদের সৃষ্টিগত অবস্থান ও যোগ্যতার বিচারে স্তরবিন্যাস করেছেন। এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন পৃথিবীতে কিভাবে জীবজন্তু ও বস্তুসমূহের উৎকর্ষ ঘটেছে। যার একদম প্রথম স্তরে রয়েছে, বস্তুসমূহের চারটি মৌল উপাদান– মাটি, আগুন, বায়ু, পানি। এর উপরে রয়েছে, পাথরের স্তর, (ইবনে খালদুন বলেছেন খনিজ স্তর)। পাথর অস্তিত্বশীল একটি বস্তুমাত্র, নিষ্প্রাণ। এর উপর রয়েছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, কিন্তু এটা জড়। এর উপরে সমস্ত প্রাণীকুল। তাদের প্রাণ আছে এবং নিজ শক্তিতে চলাফেরা করতে সক্ষম। তারপর মানুষ। এদের প্রাণ, চলাফেরার শক্তির পাশাপাশি রয়েছে বুদ্ধি ও চিন্তা করার ক্ষমতা। এসব হলো দৃশ্যমান বস্তুজগতের স্তরসমূহ। মানুষ একই সাথে দৃশ্যজগৎ এবং অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। তার পচনশীল মাটির দেহটি ইহ জগতের, কিন্তু তার অবিনশ্বর আত্মা ঊর্ধ্বলোকের। মানুষের মাধ্যম হয়ে দৃশ্য জগতের স্তর উন্নীত হবে অদৃশ্য জগতের বা আলমে আকলীর স্তরে। এর প্রথম স্তরে মাহাকাশ ও গ্রহ নক্ষত্র। এর উপরে বিশ্ব-আত্মা বা (Universal Soul)। জগতের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের চালিকা শক্তি। এর উপরে বোধগম্য জগতের স্তর (Inteligible Souls) অর্থাৎ, ফেরেশতা, মানবাত্মা বা এমন অদৃশ্য সৃষ্টি যাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আর সবার উপর স্তরে রয়েছেন একক বা আল্লাহ।

উপর থেকে ক্রমানুসারে স্তরবিন্যাস করলে চিত্রটি এমন দাঁড়ায়–

(ক) একক বা আল্লাহ।

(খ) উপলব্ধিগত আত্মার স্তর (Inteligible world)।

(গ) বিশ্ব-আত্মা (Universal soul)।

(ঘ) গ্রহ-নক্ষত্র।

(ঙ) মানুষ।

(চ) প্রাণীকুল।

(ছ) উদ্ভিদ।

(জ) খনিজ স্তর।

(ঝ) পৃথিবীর চার মৌল উপাদান। (এই স্তরটি প্লাটিনাস যুক্ত করেছেন)

সৃষ্টির ধারা

সৃষ্টিজগতের এই স্তরবিন্যাস ও শৃঙ্খলকে The Great Chain Of Beings বলা হয়। এই শৃঙ্খলে থাকা কোন বস্তু তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে না। সক্রেটিস মনে করতেন, প্রতিটি স্তর অপর স্তরের সাথে কিছু কিছু দিক দিয়ে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের মাঝেই এমন কিছু গুণাগুণ আছে, যা তার উপরের স্তরেও পাওয়া যায়। এই কমন এলিমেন্টসের মাধ্যমে স্তরগুলোর পারস্পরিক সংযোগ তৈরী হয়েছে। এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মুসলিম দার্শনিকগণ।

Great chain of being থেকে একথা বুঝা অসম্ভব যে, একটি স্তর পরিবর্তিত হয়ে অপর স্তরে উন্নীত হয়েছে। বরং গ্রীক দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিলো, গোটা জগৎ তার যাবতীয় সৃষ্টিকুল-সহই অনাদি অবিনশ্বর। এই সৃষ্টির কোন শুরু নাই, শেষও নাই, এটা অখণ্ড এবং অপরিবর্তনীয়। নতুন কিছু সৃষ্টিও হয় না, আবার কোনকিছু ধ্বংসও হয় না। সবকিছু শুরু থেকে ছিলো, এবং চিরকাল থাকবে। যারা ইলমুল কালামের সাথে পরিচিত তারা 'ক্বিদামুল আ-লাম' নামক বাক্যটির সাথে পরিচিত আছেন। ইসলামী দর্শন এবং গ্রীক দর্শনের সাথে যে কয়টি মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার মাঝে এটি একটি। আমরা স্রেফ আল্লাহর ক্ষেত্রে অনাদি ও অবিনশ্বর হওয়ার কথা বলি।

সুতরাং গ্রীক দার্শনিকদের কাছে কোন বস্তুর এক স্তর থেকে পরিবর্তিত হয়ে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়াটা অবান্তর কথা। তথাপি অনেককেই দেখেছি, তারা যখন বিবর্তনবাদের জিনিওলজি বর্ণনা করেন তখন প্লেটো, এরিস্টটল বা অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের থেকে শুরু করেন। আদতে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের সাথে এই গ্রান্ড স্ট্রাকচারের সম্পর্ক ডায়ালেক্টিক্যাল। তবে ডারউইন এই স্তরবিন্যাস থেকে তার বিবর্তনবাদের ধারণাটি মডেল হিসেবে পেয়ে থাকতে পারেন। যেহেতু The Great Chain Of Being তত্ত্বের ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। এক চিঠিতে তিনি জনৈক ডাক্তার হবস্-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সক্রেটিসের 'দ্য হিস্ট্রি অব অ্যানিম্যাল' বইটি দেয়ার জন্য।

দুই. মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক দর্শন থেকে অবাধে গ্রহণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় The Great Chain Of Being এর ধারণাটিও গ্রহণ করেছেন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এটা ব্যবহার করেছেন। আরবীতে বলা হয়, سلسلة وجود العظمي -তবে যথারীতি মুসলিম দার্শনিকগণ এই তত্ত্বকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি– ইখওয়ানুস সাফা, মিসকাওয়াইহ ও ইবনে খালদুন প্রমুখদের বক্তব্য প্রায় একই। বরং ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দিমায় মিসকাওয়াইহ-এর আল ফাওযুল আসগার কিতাব থেকে কিছু কাট-ছাঁট করে অনেকটা আক্ষরিক

অনুলিপি করেছেন। সেজন্য এই তিনজনের ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে না বলে একই সাথে বলা যায়। আমি আলোচনার সুবিধার্থে ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমাকে সামনে রেখেছি এবং সেখান থেকে তার বক্তব্যের সারনির্যাসটুকু উপস্থাপন করবো।

ইবনে খালদুন বলেন, "আমরা যদি জগতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই পুরো সৃষ্টি জগতটাই খুব চমৎকারভাবে স্তরিত ও বিন্যস্ত এবং কার্য ও কারণের সাথে মজবুতভাবে সম্পৃক্ত। একটি সৃষ্টি আরেকটি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে পৃথিবীর মৌল উপাদান তৈরী হলো, সৃষ্টির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। জমিনে সৃষ্টি হলো মাটি, তারপর একে একে পানি, হাওয়া ও আগুন। এই চারটির প্রতিটিই একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। এবং এদের মাঝে এমন কিছু যোগ্যতা আছে যার মাধ্যমে সে তার নিম্ন স্তরে বা উপরের স্তরের বস্তুতে পরিণত হতে পারে।

তারপর আমরা দেখি, সৃষ্টি জগতের শুরু হয়েছে খনিজ থেকে। তারপর আসলো উদ্ভিদ, এর ধারাবাহিকতায় অনুপম আকারে সৃষ্টি হলো প্রাণী জগৎ। তারপর চিন্তা ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।"

(এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বুঝাতে গিয়ে ইবনে খালদুন শব্দ ব্যবহার করছেন– তাদরীজ, (تدريج) যা ক্রমপর্যায় বুঝায়। আর বিবর্তন বুঝানো হয়– তাত্বাওউর (تطور) শব্দ দিয়ে।)

"এই প্রতিটি স্তর আবার বহুস্তর বিশিষ্ট। খনিজের সর্বোচ্চ স্তর উদ্ভিদের সর্বনিম্ন স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঘাস বা বীজহীন উদ্ভিদ। এরা প্রায় নিষ্প্রাণ, অন্যান্য উদ্ভিদের মতো এরা বাড়ে না। আবার উদ্ভিদের সর্বোচ্চ স্তর প্রাণীর সর্ব নিম্নস্তরের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্ভিদের সর্বোচ্চ স্তর হলো খেজুর গাছ। খেজুর গাছের সাথে শামুক ও ঝিনুকের সম্পৃক্ততা আছে। কেননা শামুক ও ঝিনুকের কেবল প্রাণ এবং স্পর্শ শক্তিটুকুই আছে, অন্য কোন অনুভূতি শক্তি নেই।"

খেজুর কিভাবে উদ্ভিদের সর্বোচ্চ স্তর হয়, সেটা মিসকাওয়াইহ এবং ইখওয়ানুস সাফা-এর দার্শনিকগণ বর্ণনা করেছেন। তারা প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের ফুফু খেজুর গাছের যত্ন নিও, কেননা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম সৃষ্টির পর অবশিষ্ট মাটি থেকে।

হাদীসটি যদিও জাল, কিন্তু এখান থেকে একটি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তারা যদি তথাকথিত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হতেন, তাহলে আদম সৃষ্টি সম্বলিত কোন হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করতেন না।

ইবনে খালদুন বলেন, "এই যে আমি বলছি একটার সর্বনিম্ন পর্যায়ের সাথে অপরটার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পৃক্ততা আছে, এই সম্পৃক্ততার মানে কী? এর মানে হলো, এদের উভয়ের মাঝে কিছু কমন এলিমেন্টস (সাধারণ উপাদান) আছে, যার মাধ্যমে সে অপর স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিংবা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সে অপর স্তরের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এই কমন এলিমেন্টসই তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করে রাখে।" যে কথা সক্রেটিসও বলেছেন।

ইবনে খালদুন বলেন, "প্রাণীদের সর্বোচ্চ স্তর হলো বানর। বানরের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা আছে। কেননা বানর কিংবা এ জাতীয় প্রাণীদের অনুভূতি শক্তি, চালচলন, এমনকি কিছু কিছু দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের বেশ কাছাকাছি। কিন্তু সুসংহতভাবে চিন্তার ক্ষমতা, উন্নত বুদ্ধি, বাকশক্তি ইত্যাদির কারণে তারা মানুষের চেয়ে অনেক নিচের স্তরের প্রাণী।"

আমাদের উদ্দিষ্ট আলোচনা এতটুকুই। বাকি খালদুন তার সৃষ্টি শৃঙ্খলার বিবরণ আল্লাহ পর্যন্ত দিয়েছেন।

তো, ইখওয়ানুস সাফা, মিসকাওয়াইহ ও ইবনে খালদুনের এই লেখায় বানর শব্দটির উল্লেখ পেয়ে সকলেই প্রায় চোখবুজে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, এটা ডারউইনিয়ান বিবর্তনবাদের প্রি-স্ট্রাকচার না হয়েই যায় না। কিন্তু কথার পূর্বাপর চিন্তা করে এবং এই বক্তব্যের মূল উৎস সন্ধান করে কেউ ভেবে দেখারও প্রয়োজন অনুভব করেন না যে, বিবর্তনবাদের সাথে এই কথার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। এই কথা থেকে কি কোনভাবে বুঝে আসে যে, তিনি বানর থেকে মানুষ হওয়ার তত্ত্ব বলেছেন? তাদরীজ এবং তাত্বাউর শব্দদয়ের পার্থক্য আমরা বলে এসেছি আগেই। বানরের সাথে আমাদের বহু সাদৃশ্যের কথা কেউ কি কখনো অস্বীকার করেছে? কিন্তু কারো সাথে কিছু বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেই কি ওই জিনিস থেকে বিবর্তিত হয়ে আসাটা আবশ্যক? যদি তাই হয়, তাহলে ইবনে খালদুনের তত্ত্ব অনুযায়ী শামুকের বিবর্তন খেজুর গাছ থেকে, ঘাসের বিবর্তন খনি থেকে এবং ফেরেশতার বিবর্তন মানুষ থেকে হওয়াটা আবশ্যক হয়। সেটা কি এই নব্য বিবর্তনবাদীরা স্বীকার করেন?

ইবনে খালদুন এবং মিসকাওয়াইহ, উভয়েই এই আলেচনা এনেছেন নবুওয়াতের অধ্যায়ে। খালদুন এই অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন– আমরা এখন নবুওয়াতের হাকীকত নিয়ে আলোচনা করবো পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যানুযায়ী। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এই দৃশ্যমান বস্তুজগতে যাবতীয় সৃষ্টিসমূহের যে স্তরবিন্যাস রয়েছে, এর মাঝে সর্বোচ্চ স্তরে মানুষের অবস্থান। এই মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ স্তরে আছেন নবী ও রাসূলগণ। মানুষের সাথে ঊর্ধ্বজগতের যে সম্পর্ক সেটা নির্মাণ হয়েছে তাদের মাধ্যমে। একজন নবীর উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি এই বাহ্য জগৎ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্কিত হন। এভাবে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের সাথে আলামে মালাকুত বা ফেরেশতা জগতের সাথে সম্পৃক্ততা তৈরী হয়। অর্থাৎ, যেভাবে মানুষ সৃষ্টিকুলের সর্বোচ্চ স্তরে আছে, তেমনই মানুষদের মাঝে সর্বোচ্চ স্তরে আছেন নবী রাসূলগণ।

এর অব্যবহিত পরেই খালদুন রূহের প্রকার নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে তিনি কয়েক প্রকার রূহের কথা বলেন– এর মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রূহ হলো নবী ও রাসূলদের। তাদের রূহ কেবল এই ইহলোকেই নয়, বরং মাঝেমাঝে তা ইহলোক ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু পুরো ধারণাটা তিনি ঠিকই গ্রীক দর্শন থেকে নিয়েছেন। এটা একদম স্পষ্ট বিষয়।

সেদিন এক ভদ্রলোক ইবনে খালদুনকে বিবর্তনবাদী বানাতে গিয়ে যা তা বলছিলেন এবং আমাকে গোবেচারা কিসিমের বোকা-কান্ত পেয়ে বলে বসলেন, ইবনে খালদুন আদম-হাওওয়ার যে প্রচলিত ন্যারেটিভ (গল্প-আখ্যান) আছে ধর্মের বইয়ে, সেটাতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, আদম-হাওওয়া বলতে নির্দিষ্ট কোন একজন পুরুষ ও নারীকে বুঝায় না, বরং মানুষের একটি দলকে বুঝায়। মানে, যারা কেবল বিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছে। এমন উদ্ভট কথা ইবনে খালদুন কোন কিতাবে বলেছেন, কিভাবে বলেছেন সে সবের কিছুই তিনি জানালেন না। কিন্তু আমি যখন 'তারীখে ইবনে খালদুন' উল্টালাম, তখন কিতাবের একদম প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখি তিনি লিখেছেন– "বংশবিদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের বংশতালিকা শুরু হয়েছে আদম ও হাওওয়া থেকে। তারাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ।"

এরপর ইবনে খালদুন আদম সৃষ্টি সম্পর্কিত বেশকিছু আয়াত উল্লেখ করেন এবং সে সংক্রান্ত আলোচনা করেন। কিন্তু এর মাঝে এমন একটি শব্দও পাইনি, যা থেকে বুঝা যাবে যে, আদম আ.-এর প্রথম মানুষ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন ধরণের সন্দেহ আছে, কিংবা তিনি এসবের কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। একই কথা মিসকাওয়াইহ-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার রেখে যাওয়া প্রচুর কিতাব এখনও বিদ্যমান আমাদের মাঝে। এর কোনোটা থেকে কেউ আজ পর্যন্ত এটা বের করতে পারেনি যে, তিনি আদম আ.-এর প্রথম মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করছেন! তাহলে তারা কোন ধরণের বিবর্তনবাদের সন্ধান দিয়ে গেলেন? ভাবা যায়, এই একটা দুইটা প্রচ্ছন্ন শব্দ আর বাক্য দিয়ে একেকজন মানুষের উপর এতো বড় বড় বোঝা কী অবলীলায় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে! তারপর শুরু হয় এক অসম মল্লযুদ্ধ। তখন লেখকের অন্যান্য স্পষ্ট বক্তব্যকেও মারপ্যাঁচে ফেলে নিজের অলীক দাবী ও ব্যাখ্যার মোয়াফেক করে রাখার অনর্থক চেষ্টা!

জাহেযকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখান বিবর্তনবাদীরা। অনেকেই মনে করেন, জাহেয ডারউইনের চেয়েও অ্যাডভান্স ছিলেন বিবর্তনবাদী তত্ত্বে। এই ভেবে আমাদের কতিপয় মুসলিম ভাই এক ভিন্ন রকমের গৌরব অনুভব করেন ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু এই গৌরব দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষের অ্যাকাডেমিক জালিয়াতি, বক্তব্যের ইচ্ছাকৃত মিস ইন্টারপ্রিটেশন, সর্বোপরি এক বৃহৎ অসততার উপর।

প্রতিটি প্রাণী তার নিজের খাবার সংগ্রহ এবং অপরের খাবার না হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামরত। এটা একটা দৃশ্যমান বাস্তবতা, কোন তত্ত্ব নয়। জাহেয এই কথা বলেছেন। ইঁদুর যখন খাবার সংগ্রহের জন্য বের হয়, তখন সে নিজে যেন অন্যের খাবারে পরিণত না হয়, সেদিকেও সতর্ক থাকে। জাহেয তার কিতাবুল হাইওয়ানে এটা দেখিয়েছেন এবং এ-ও দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ, প্রতিবেশ অনুযায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য দান করেন। আফ্রিকার মরুসিংহ বাংলাদেশের সুন্দরবনে টিকবে না, তেমনি নর্থ পোলের শ্বেতভল্লুক সাহারার মরু অঞ্চলে একদিনও টিকবে না। একইভাবে ভৌগলিক ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীকুলের স্বভাব-চরিত্র ও চাল-চলনে কী পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হয়, সেটা দেখিয়েছেন। ইবনে খালদুনও তার মুকাদ্দিমায় এই আলোচনা এনেছেন।

কিন্তু জাহেযের নামে যেটা বলা হয়, তিনি বলেছেন, প্রাণীরা তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তাদের পরবর্তী বংশধরের কাছে পৌঁছে দেয়, সেটা এক অলৌকিক কথা। তার কিতাবাদি ঘেঁটে এমন কথার সন্ধান মেলে না।

ইন্টারনেটে যত আর্টিক্যাল পাবেন জাহেযের বিবর্তনবাদ বিষয়ে সবগুলোতে এমন প্রচুর বায়বীয় কথা-বার্তা পাবেন তার নামে। এর উৎস হলো মেহমুত বায়ারকদার নামক এক তুর্কী মুসলিম গবেষক Al- jahij and the rise of biological evolution নামে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। সেটা ছাপা হয় লন্ডনের নামি-দামি একটি সাইন্স জার্নাল থেকে। সেখানে তিনি এমন অনেক কাণ্ড ঘটিয়ে রেখেছেন। ভুল তরজমা, মনগড়া ব্যাখ্যা, কখনো নিজের কথাকে জাহেযের কথা বলে চালিয়ে দেয়া এবং যথাযথ সূত্র ও রেফারেন্স না দেয়া– সবমিলিয়ে খুবই নিম্নপর্যায়ের চাতুরিপূর্ণ একটি গবেষণাপত্র ছিলো সেটা। কিন্তু সেই গবেষণাপত্রটিই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় সকলের কাছে। অসংখ্য বই, আর্টিক্যাল ও রিসার্চ পেপারে এর সাইটেশন আছে। তার মতো এরকম আরও কয়েকজনের এই অতিউৎসাহী কর্মকাণ্ডের কারণে মানুষ কোন বাছবিচার ছাড়াই জাহেযকে ডারউইনিয়ান বিবর্তনবাদের গুরু মেনে বসে আছে।

ডক্টর মেহমুতের জালিয়াতির একটা উদাহরণ দেই।

পূর্বের যুগের অনেক সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন প্রাণীতে রূপান্তরিত করেন। কোন সম্প্রদায়কে বানর, কোন সম্প্রদায়কে শুকর, আবার কাউকে শয়তানের উপাস্যেও পরিণত করেছেন। তো, জাহেয চতুষ্পদ প্রাণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন– "শাস্তিস্বরূপ চতুষ্পদ প্রাণীতে রূপান্তরিত হওয়ার (মাস্‌খ) ব্যাপারে নানান ধরণের কথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, আজকের চতুষ্পদ প্রাণীরা তাদের বংশধর নয়; বরং যাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো তাদের মৃত্যুর মাধ্যমেই এর বংশধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তবে বানরের বংশধর রয়ে গেছে। অর্থাৎ এখনকার বানরেরা সেই শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের বংশধর। তাদেরকে রেখে দেয়া হয়েছে মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, যারা শাস্তিস্বরূপ পশুতে রূপান্তরিত হয়েছিলো, তাদের বংশধররাই এখন পর্যন্ত বহাল আছে এবং তাদের বংশ থেকেই অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি হয়েছে। একই কথা তারা সাপের ব্যাপারেও বলে। "

তো এই হলো জাহেযের বক্তব্য। তার এই আলোচনা মূলত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পূর্বের যুগের শাস্তিপ্রাপ্ত পশু হয়ে যাওয়া মানুষদের বংশ বিস্তার হয়েছে কি হয়নি? কিন্তু এই আলোচনাকেই জনাব মেহমুত একটি কংক্রিট বিবর্তনবাদী থিউরিতে রূপান্তরিত করলেন। তিনি এই প্যারার অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন–

He says: people said different things about the existence of al-miskh (original form of the quadruped). Some accepted itÕs evolution, and said that, it gave existence to dog, wolf, fox, and their similars.

The members of this family came from this form (al-miskh).

এই অংশটুকুর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অনেক বই ও আর্টিক্যালে, আমি নিজে দেখেছি বেশ কয়েক জায়গায়। অথচ এখানে জাহেযের কথার পুরো অর্থটাকেই পাল্টে দেয়া হয়েছে এবং সুযোগমতো তার উদ্দিষ্ট ইভ্যুলোশন (বিবর্তনপ্রক্রিয়া) শব্দটি বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিবর্তনবাদকে এডাপ্ট করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আদম ও হাওয়া সৃষ্টির কাহিনীকে অস্বীকার করতে হবে, নতুবা বিবর্তনবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এমন কোন ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু ইসলামের এই সুদীর্ঘ জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এমন কাউকে আমরা দেখি না যারা এই কাজটি করেছেন। না জাহেয, না ইবনে খালদুন, না মিসকাওয়াইহ, না ইখওয়ানুস সাফা। তারা সকলেই নিজেদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের বংশধর মনে করতেন। এর হাজার হাজার প্রমাণ রয়েছে। নিজেদেরকে তারা বানরের 'কাজিন' মনে করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যেমন রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন– "এতে সামান্যতম কোন সন্দেহও নেই যে, আমরা বানরের কাজিন!!!"

লেখক : তরুণ আলেম ও লেখক

সতর্ক সাইরেন

এনজিওর ফাঁদে বৃহত্তর বেড়িবাঁধ এলাকা

নাঈম বিন মাসউদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এনজিও আগ্রাসন প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

গত ৩৩তম সংখ্যায় এনজিও সংস্থাগুলো কর্তৃক নিম্নআয়ের অসচ্ছল, অশিক্ষিত ও অসচেতন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সেবার মোড়কে নাস্তিক্যবাদের প্রচারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছিল। এ পর্যায়ে আমরা এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

এক. ইসলামী গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

এদেশের ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নিরাপদ রাখতে এবং প্রচলিত এনজিও-শিক্ষার প্রভাবদূর করতে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের বিকল্প নেই। শিশুদের কোমল মনে এবং কিশোরদের জ্ঞান-উন্মুখপ্রাণে এনজিও সংস্থাগুলোর সুপরিকল্পিত ও আকর্ষণীয় শিক্ষাব্যবস্থা যে সুগভীর রেখাপাত করে তা নির্মূল হতে পারে কেবল সুপরিকল্পিত ও মেয়াদী ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারাই। এর জন্য সতর্কতামূলক সাময়িক আলোচনা যথেষ্ট নয় এবং তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরও হয় না।

স্বাভাবিকভাবে যাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্বীন শেখার আগ্রহ বিদ্যমান, বা যারা নিজ সন্তানকে জরুরী দ্বীনী শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তাদের জন্য মসজিদ-মাদরাসায় উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে দ্বীন শেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু এনজিও-আক্রান্ত এলাকার যে সকল অসচ্ছল মানুষ নিজেদের ঈমান-আমলের ব্যাপারে উদাসীন এবং নিজ সন্তানদের আবশ্যকীয় দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অনাগ্রহী, তাদের কাছে গিয়ে তাদের দোরগোড়ায় জরুরত পরিমাণ দ্বীনী শিক্ষা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো, তাদের এলাকায় গিয়ে বাড়ির উঠোনে বা কোনো খোলা জায়গায় বসে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এনজিও-আক্রান্ত পাড়া-মহল্লা বা গ্রাম-গঞ্জে পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে, যার মূল কারিকুলাম হবে নূরানী তা'লীম ও ফরজে আইন কোর্স। দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হতে পারে দুইবছর ব্যাপী। প্রথম বছর থাকবে নূরানী কায়দা ও মৌলিক মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং দ্বিতীয় বছর থাকবে কুরআনুল কারীম নাযেরা পড়া এবং ফরযে আইন ও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতসমূহ শিক্ষার ব্যবস্থা।

মধ্যমমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালিত হবে এক বছরের জন্য। এতে থাকবে নূরানী তা'লীম ও ফরযে আইন কোর্সের ব্যবস্থা। আর স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালিত হবে ছয় মাসের জন্য। অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষা-কার্যক্রমের সিলেবাস স্থানীয় উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে হবে।

তবে শিক্ষার জন্য এতটুকু ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট নয়। এরপরও প্রত্যেক শিশুকে মাদরাসায় ভর্তি করার চূড়ান্ত চেষ্টা ও ফিকির করতে হবে, যাতে তাদের ঘরে ঘরে ইসলামী শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে তাদেরই মধ্য হতে মানুষ তৈরি হয়ে যায়। প্রয়োজনে এর জন্য মাদরাসায় ভর্তির সময় ও ভর্তির পর প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে শিশুর সার্বিক সুবিধাও নিশ্চিত করতে হবে।

দুই. প্যারেন্টস কনফারেন্স

মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতিকে টার্গেট করে পরিচালিত এনজিও অপতৎপরতা ব্যর্থ করতে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য স্থানীয় আলেম ও মসজিদের ইমাম সাহেবদের উদ্যোগে প্রতি চার বা ছয় মাস অন্তর অন্তর অভিভাবক সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে যেমনিভাবে জনসাধারণের মধ্যে এনজিওদের অপতৎপরতা ও কূটকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা জাগরুক থাকবে, তেমনিভাবে সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ও উপকারিতাও বুঝে আসবে।

তিন. মাসতুরাতের তা'লীম

পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি মহিলা মহলে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য দ্বীনী তা'লীমের আয়োজন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এনজিওরা যেসব আকর্ষণীয় প্রজেক্ট নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করে থাকে এর মধ্যে তথাকথিত 'নারী অধিকার' বা 'নারী স্বাধীনতা' অন্যতম। একটি মেয়ে কৈশোরে উপনীত হওয়ার সময় থেকে এনজিওদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার মাধ্যমে তার কোমল মনে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব, ভিন্ন ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত সহানুভূতি এবং অপসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের বীজ বপন করে দেয়া হয়। নারী অধিকারের চটকদার বুলি আওড়িয়ে প্রতিটি মেয়েকে গড়ে তোলা হয় পরিবার-বিদ্বেষীরূপে। ফলে একেকটি মেয়ে পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে ইসলামের অন্যতম ফরয বিধান পর্দার প্রতিও ওরা স্বভাবজাত বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

এ কারণে স্বতন্ত্রভাবে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে মাসতুরাতের তা'লীম অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অনেক মা-বোনকে এনজিওদের খপ্পরে পতিত হওয়া থেকে সহজে বাঁচানো যায়।

চার. পুরুষদের তাবলীগ জামাআতে পাঠানো

তাবলীগ জামাআতকে ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা বলা হয়। এনজিও-আক্রান্ত এলাকার পুরুষদের নিয়মিত তাবলীগ জামাআতে পাঠানোর মাধ্যমে দ্বীন ও দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। তা হলে তাবলীগ জামাআত থেকে সচেতনতা লাভ করে পরবর্তীতে তারাই এলাকায় গণসচেতনতার কাজ করবেন, ইনশাআল্লাহ। স্থানীয় তাবলীগ জামাআতের সাথীরা এ বিষয়ে যত্নবান হলে এটা অত্যন্ত সহজ হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এভাবে তাবলীগী মেহনতের মাধ্যমে এনজিও-আক্রান্ত এলাকায় অনেক ফায়দা হয়ে থাকে।

পাঁচ. বিশেষ উপলক্ষে ত্রাণ বিতরণ

এনজিও সংস্থাগুলো বিভিন্ন বিশেষ সময় ও বিশেষ উপলক্ষে জরুরি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, চিকিৎসা সেবা ও বস্ত্র বিতরণ করে থাকে। তাদের এ কর্মপন্থাটি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে, এমনকি দ্বীন সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন অনেক মানুষকেও দেখা গেছে, এনজিওদের

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জরুরী মাসাইল

যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

যাকাতদাতা

সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন বালেগ মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চান্দ্র মাস হিসেবে ঠিক একবছর কাল অতিক্রান্ত হলে, যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

নিসাবের পরিমাণ

ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য, অথবা তৎসমমূল্যের নগদ টাকা, বা ব্যবসার মালের মালিক হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়।

যাকাতগ্রহীতা

যাকাত এমন সব গরীব ও ফকীর-মিসনকীনকে দিতে হবে, যাদের নিকট নেসাব পরিমাণ মাল নেই। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন বা খিদমতে রত নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে যাকাত-ফিতরা দান করলে, দ্বীনী খিদমতের সহযোগিতা হিসেবে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

যাদের সাথে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে, যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমূখ এবং দাতার সাথে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে, যেমন ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত-ফিতরা দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত-ফিতরা দিতে পারে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তিকে দান করলেও যাকাত ফিতরা আদায় হয় না। যাকাত গ্রহীতাকে যাকাতের মালিক না বানিয়ে শুধু উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিলেও যাকাত আদায় হয় না। ব্যক্তি মালিকানায় না দিয়ে সামগ্রিক মালিকানা করে দিলে অথবা কোনো বস্তু বা শ্রমের বিনিময়ে যাকাত প্রদানে করলেও যাকাত আদায় হয় না।

যাকাত আদায়ের সময়

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়টি যদি রমাযান মাস না হয়ে অন্য কোন মাস হয় তাহলে সে মাসেই যথা তারিখে সমুদয় মালের যাকাতের সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ করে যাকাতের পরিমাণ বের করা জরুরী এবং আদায়ের ক্ষেত্রেও রামাযানের অপেক্ষা না করাই উত্তম। কারণ, কোন লোক রামাযান আসার পূর্বে যদি ফরয যাকাত আদায় না করেই ইন্তেকাল করে, তাহলে যাকাতের ফরয তার জিম্মায় থেকে যাবে। তবে ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই যদি রামাযানে যাকাত অগ্রিম আদায় করে তাতেও কোন দোষ নেই। এভাবে সারাজীবন অগ্রিম যাকাত দিতে থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৭, ১৯২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৫৫, কিফায়াতুল মুফতী ৪/২৬২)

হজ্বের জন্য জমাকৃত টাকার যাকাত

প্রশ্ন : হজ্বের জন্য রাখা আনুমানিক ৫,৪০,০০০ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার উপর এ বছর যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : হজ্বের জন্য রাখা টাকাসহ যে টাকা যাকাতের হিসেবের সময়ে আপনাদের হাতে ঋণ মুক্ত অবস্থায় থাকবে, তার সমূদয় টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ কোনো কাজের উদ্দেশ্যে গচ্ছিত টাকা যে যাবত সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা না হবে সে যাবত তা যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে হজ্বের উদ্দেশ্যে এজেন্সিকে অগ্রীম হস্তান্তর করা হলে তাতে আর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং হজ্বের জন্য জমানো টাকা যাকাতের আওতামুক্ত রাখতে চাইলে আপনার যাকাতের বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এজেন্সির প্রাপ্য টাকা এজেন্সিকে অগ্রীম পরিশোধ করে দিন। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫৯, ২৭১, ২৮৮, নিযামুল ফাতাওয়া ২/২০৩)

সমিতির টাকার যাকাত

প্রশ্ন : সমষ্টিগত টাকার উপর যাকাত আসবে কিনা? কোন সমিতির টাকা দিয়ে যদি ব্যবসা করা হয়, তাহলে কি সমষ্টিগত টাকার নেসাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, নাকি সদস্যদের প্রত্যেকের অংশের টাকার পরিমাণ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে?

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে সমষ্টিগত টাকার নেসাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, বরং যাকাত সর্বাবস্থায় মালিকের উপরে ওয়াজিব হয়। সুতরাং সমিতির প্রত্যেক সদস্যের জমাকৃত টাকা যদি নেসাব পরিমাণ হয় অথবা জমাকৃত টাকার সাথে ঋণমুক্ত সদস্যদের অন্য টাকা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতযোগ্য অন্য সম্পদের মূল্য মিলিয়ে যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (আল-হিদায়া ৩/১৭৭, আল-বাহরুর রায়িক ৭/২৩৫, ২৪৬)

ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের যাকাত

প্রশ্ন : মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট জানার বিষয় হচ্ছে, আমার ব্যবসার প্রাথমিক তহবিল ছিল ৬২,৫০০/- টাকা। ১১ মাস ব্যবসায় খাটানোর পর মূলধন বৃদ্ধি ও পূর্বের লাভসহ ১,২৫,০০০/- টাকা ১ বছর ৯ মাস যাবত বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কোন পরিমাণ টাকার উপর যাকাত দিব?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির নিকট যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ (যা বর্তমান রৌপ্যের মূল্যমান হিসেবে প্রায় ৬০,০০০/- টাকা হয়) বা ব্যবসায়িক পণ্য এক বছর পর্যন্ত থাকে এবং তা ঋণমুক্ত হয়, তাহলে তার উপর বছরান্তে উপরোল্লিখিত ধরণের মোট সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সে হিসেবে আপনি যখন ঋণমুক্ত অবস্থায় ৬২,৫০০/- টাকার মালিক হয়েছেন তখন থেকে নিয়ে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় মূলধন ও লাভসহ আপনার যে পরিমাণ টাকা ছিল তার চল্লিশ ভাগের একভাগ হিসেব করে যে টাকা আসে তা আপনার জন্য যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। তেমনিভাবে ৬২,৫০০/- তথা নেসাবের মালিক হওয়ার তারিখ থেকে চান্দ্র বছর হিসেবে প্রতি বছরের শেষে যে টাকা বা সম্পদ থাকবে তার যাকাত উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আদায় করবেন। নগদ টাকা বা সোনা-রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যবসায় খাটানো যেমন জরুরী নয় তেমনি সকল যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর বছর পূর্ণ হওয়াও জরুরী নয়; বরং ন্যূনতম নেসাবের উপর বছর পূর্ণ হলেই যাকাত আদায় করতে হবে।

ব্যবসার পণ্যের যাকাত

প্রশ্ন : হাতে অবিক্রিত পণ্য আছে, কিন্তু ক্যাশ টাকা নেই। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে যাকাত আদায় করব?

উত্তর : হাতে ক্যাশ টাকা না থাকা অবস্থায় চাইলে আপনি ব্যবসায়িক পণ্য দিয়ে আদায় করতে পারেন। তেমনিভাবে পণ্য বিক্রয় করে বা মূল্যমান হিসেব করে নগদ টাকা দিয়েও আদায় করতে পারেন।

বিগত বছরের অনাদায়ী যাকাত

প্রশ্ন : এক বছরের যাকাতের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে কিন্তু পূর্ণ যাকাত আদায় করা হয়নি। এমতাবস্থায় পরবর্তী বছরের যাকাত কিভাবে আদায় করব? রেফারেন্সসহ সমাধান কাম্য।

উত্তর : যাকাত আদায়ে গড়িমসি করা উচিৎ নয়, তাই নগদে আদায় করে দেওয়াই শ্রেয়। প্রয়োজনে অগ্রীম আদায় করবে; কিন্তু বকেয়া রাখবে না। তবে কোন কারণে যদি বছরান্তে পূর্ণ যাকাত আদায় করা না হয়, তাহলে পরবর্তী সুযোগেই তা আদায় করে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী বছরে যাকাত হিসেব করার সময়ে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী যাকাতের অর্থ চলতি বছরের নেসাব থেকে বাদ যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬০, ২৬৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/২৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১২২)

প্রশ্ন : আমার বিগত কয়েক বছরের যাকাত আদায় করা হয়নি। আমার যাকাতের মাল হল স্বর্ণ ও টাকা। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমি আমার বিগত বছরগুলোর যাকাত কোন মূল্য হিসেবে আদায় করব, বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে, নাকি পূর্বের বছরগুলোর মূল্য হিসেবে?

উত্তর : আপনার স্বর্ণ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে বিগত বছরের যাকাত আদায় করবেন। আর যদি স্বর্ণের মূল্য ও টাকা মিলে নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বিগত বছরের অনাদায়ি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় তথা পূর্বের বছরগুলোর মূল্য হিসেবে স্বর্ণের মূল্য হিসেব করে যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৮, ফিকহুয যাকাত; পৃষ্ঠা ২৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৫৩৬)

ফ্ল্যাট বুকিং মানির যাকাত

প্রশ্ন : আমি একটি ডেভেলপার কোম্পানীর কাছে ফ্ল্যাট বুকিং দিয়েছি। তারা এখনও নির্মাণ কাজ শুরু করেনি। ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার করবেন আরও ৪/৫ বছর পর। আমি কিছু টাকা বুকিং মানি হিসেবে দিয়েছি এবং মাসিক কিস্তিতে বাকি টাকা পরিশোধ করব। আমার কি এই টাকার (যেটা জমা হচ্ছে) যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : নির্মাণাধীন কিংবা নির্মাণ সাপেক্ষ বস্তু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে বুকিং মানি বা কিস্তি ভিত্তিক টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে তা মূলত অগ্রীম ক্রয়মূল্য। সুতরাং তার যাকাত আপনাকে দিতে হবে না। কেননা উক্ত টাকা ফ্ল্যাটের মূল্য হিসেবে আপনার মালিকানা থেকে বের হয়ে কোম্পানির মালিকানায় চলে যাচ্ছে। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৩৮৯, ফাতাওয়া শামী ২/২৫৯, আল-হিদায়া- ৩/১১০)

জামানতস্বরূপ প্রদত্ত টাকার যাকাত

প্রশ্ন : ১,০০,০০০/- টাকা জামানত দিয়ে মাধ্যমিক স্কুল থেকে কিছু শর্তসহ চুক্তির মাধ্যমে একটা দোকান নেওয়া হয়েছে। জামানত দেওয়ার পরেও প্রতিমাসে দোকানটির ভাড়া বাবদ ৫৫০/- টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়।

স্বামী-স্ত্রী উপরোল্লিখিতভাবে দোকানটি স্কুল থেকে নিয়ে ৪০,০০০/- টাকা জামানত নিয়ে ৫ বছরের চুক্তিতে অন্য লোককে ভাড়া দিয়েছে। তারা মাসিক দোকান ভাড়া পান ১,১০০/- টাকা (বর্তমানে)।

উল্লেখ্য, জামানত নেওয়ার পরেও তারা মাসিক ভাড়াটা দীর্ঘ এই ১০/১১ বছর ধরে নিচ্ছেন। আবার স্বামী-স্ত্রী চাইলে যেকোন সময় দোকানটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে পারবে। তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ১,০০,০০০/- টাকা ফেরত দিবে। প্রশ্ন হলো,

(ক) উপরে বর্ণিত সূরতে দোকান নেওয়া এবং পুনরায় ভাড়া দেওয়া জায়েয হয়েছে কি না? জায়েয না হলে এখন শরীয়ত অনুযায়ী করণীয় কী?

(খ) এই এক লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে কি না? দিতে হলে কিভাবে দিতে হবে?

উত্তর : (ক) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কাছে ভাড়া দেওয়া সহীহ হয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে ভাড়া দেওয়া সহীহ হয় নাই। এটা ইজারায়ে ফাসেদ বলে গণ্য হয়েছে। কারণ তাদের চুক্তিপত্রের ২১ নম্বর শর্তে আছে– দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থায় সাবলীজ ভাড়া দিতে পারবে না। শর্তটি শরীয়ত সম্মত। কাজেই দ্বিতীয় পক্ষের জন্য উক্ত শর্ত রক্ষা করা জরুরী। শর্ত ভঙ্গ করা জায়েয নাই। সুতরাং যখন দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে ভাড়া দেওয়া জায়েয হয় নাই, এখন তাদের জন্য উচিৎ হলো তারা তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে সে দোকান ফিরিয়ে নিবে। আর এতদিন তারা যে ভাড়া তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে নিয়েছে, সে দোকানের স্বাভাবিক যে ভাড়া হয় সেটা বাদ দিয়ে অতিরিক্ত টাকা তৃতীয় পক্ষকে ফেরত দিয়ে দিবে।

উত্তর : (খ) হ্যাঁ, ঐ এক লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে। কেননা, উক্ত টাকা তাদের মালিকানায় রয়ে গেছে। জামানত রাখার দ্বারা তাদের মালিকানা শেষ হয়নি। কাজেই এ টাকার উপর যাকাত প্রযোজ্য। হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। হস্তগত হওয়ার পূর্বেও চাইলে প্রতি বছর যাকাত আদায় করতে পারবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬৬, ৩০৫, ৬/৪৫, মা'আরিফুল কুরআন ৩/১২, জাদীদ ফিকহী মাবাহিস ৬/২০, কিফায়াতুল মুফতী ১১/৪৭১)

হাউজিং এর যাকাত

প্রশ্ন : আমরা দুইভাই মিলে ঢাকা ও মাওয়া রোডে আমাদের ব্যক্তিগত কিছু জায়গা নিয়ে একটি হাউজিং গঠন করেছি এবং প্লট আকারে বিক্রয় করছি। ভবিষ্যতে হাউজিংটি বৃহৎ আকারে নির্মাণ করার নিয়তে উক্ত হাউজিং এর সাথে জমি ক্রয় করে প্লট আকারে বিক্রয় করা হচ্ছে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, কুরআন হাদীসের আলোকে উক্ত হাউজিং এর উপর আমরা কিভাবে যাকাত আদায় করবো?

উত্তর : আপনাদের ব্যক্তিগত যে জায়গা নিয়ে হাউজিং গঠন করেছেন, সেই জায়গা যদি ব্যবসার ইচ্ছায় ক্রয় করা সম্পত্তি হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর এবং পরবর্তীতে যে জায়গা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হাউজিং বড় করার লক্ষ্যে ক্রয় করেছেন, এই উভয় ধরণের জায়গা প্রত্যেকের জমির মালিকানা অনুপাতে ব্যবসার মাল হিসেবে যাকাতযোগ্য সম্পদ। যখনই আপনাদের যাকাতের নেসাবের উপর বৎসর পূর্ণ হবে, তখন উক্ত সম্পদের বাজার দর হিসেব করে নগদ পরিশোধযোগ্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর শতকরা ২.৫০% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

তবে যদি আপনাদের ব্যক্তিগত জায়গা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় না করে থাকেন, বরং নিজেরা বসবাস, চাষাবাদ বা ভাড়া দেওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ক্রয় করে

থাকেন, তাহলে এটা বিক্রি করা পর্যন্ত যাকাতযোগ্য সম্পদ বিবেচিত হবে না। বিক্রি করলে এর অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ হবে। সেক্ষেত্রে শুধু নতুন করে ক্রয়কৃত অংশের বাজার মূল্যের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫৮, ২৬৩, ২৬৭, ২৮৮, আল-হিদায়া ১/১০২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৯, ১৮১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩০৫)

ডেভেলপমেন্ট লোনের যাকাত

প্রশ্ন : ডেভেলপমেন্ট লোন যেমন, কোন ব্যক্তি দশ কোটি টাকার মালিক এবং সে ব্যাংক থেকে আরো দশ কোটি টাকা ডেভেলপমেন্ট লোন নিয়েছে তাহলে তার যাকাতের বিধান কী? কতটুকুর উপর যাকাত আসবে?

উত্তর : যদি লোনের অর্থ এমন খাতে খরচ করা হয় যা যাকাতযোগ্য নয়, যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, বাড়ি, মেশিনারিজ ইত্যাদি তাহলে লোন পরিমাণ অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবেনা। বরং যাকাতযোগ্য পূর্ণ সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি লোনের দশ কোটি টাকা দিয়ে কাঁচামাল, পন্য, বিক্রির জন্য জমি, বাড়ি বা গাড়ি ক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে যাকাতযোগ্য সামষ্টিক সম্পদ থেকে লোনের পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও যদি লোনটি কিস্তিভিত্তিক হয়, তাহলে যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসেব থেকে প্রতিবছর শুধুমাত্র এক বছরের কিস্তি সমপরিমাণ টাকার যাকাত দিবে না, বাকী যাকাতযোগ্য সকল সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। (ফিকহুয যাকাত; পৃষ্ঠা ৩৬৩, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া-আদিল্লাতুহ ১৯/৫৪৭, ফিকহী মাকালাত ৩/১৫৬, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২/৬৭)

শেয়ারের যাকাত

প্রশ্ন : আমার কিছু শেয়ার আছে। শেয়ারগুলো আমার হাতে না। কিন্তু তার মুল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন আমার এ শেয়ারের টাকার উপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : বর্তমান শেয়ার বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কাজেই অতি দ্রুত এ কারবার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর যাকাতের বিধান হলো, আপনার ঐ শেয়ারগুলো যদি এমন কোন কোম্পানির হয়ে থাকে যারা বৈধ কারবার করে, তাহলে তার বাজারমূল্যের উপর যাকাত আসবে; যা আদায় করা আপনার জন্য জরুরী। আর যদি শেয়ারগুলো এমন কোনো কোম্পানির হয় যে কোম্পানি হারাম কারবার করে, যেমন ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি তাহলে আপনার ঐ শেয়ারগুলো বিক্রি করে লাভ হলে সে লাভের অংশ এবং পূর্বে লভ্যাংশ নিয়ে থাকলে সে পরিমাণ অর্থসহ পূর্ণ টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে। (ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৩৮৩, ৩৮৫, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারত; পৃষ্ঠা ৯৩, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/২১১)

যাকাতযোগ্য পণ্যের বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য

প্রশ্ন : স্বর্ণের মূল্য যাকাত আদায়ের সময় বাজার মূল্য অনুযায়ী হবে। সেটা স্বর্ণের ক্যারেট অনুযায়ী বিক্রির মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য অনুযায়ী হবে?

উত্তর : যাকাত আদায়ের সময় স্বর্ণের বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৮৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৮৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬/১২৪, ফাতাওয়া উসমানী ২/৬৬)

অসিয়তকৃত সম্পদের যাকাত

প্রশ্ন : ১৯৯৭ সালে এক মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। তার স্বামী জীবিত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার গহনাগুলো ছোট ছেলের বউকে দেওয়ার জন্য। ১৯৯৮ সালে যখন গহনাগুলো হস্তান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন সেই ছেলে গহনাগুলো নিতে অসম্মতি জানায়।

গহনার পরিমাণ আনুমানিক ৫ ভরি। ১৯৯৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই গহনাগুলোর যাকাত দেয়া হয়নি। প্রশ্ন হলো, এখন যাকাত দিতে চাইলে কে যাকাত দিবে? কতটুকু দিবে? বিস্তারিত জানালে ভালো হয়।

উত্তর : এই গহনাগুলোর মূল্য যদি মৃত মহিলার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মূল্যের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে গহনাগুলোর মালিক হবে তার ছোট ছেলের স্ত্রী, আর এগুলোর মূল্য তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মূল্যের চেয়ে বেশি হলে এক তৃতীয়াংশের মূল্য পরিমাণ গহনার মালিক হবে ছোট ছেলের স্ত্রী, অতিরিক্তটুকু মীরাস হিসেবে বণ্টিন করে দিতে হবে। সুতরাং ছোট ছেলের স্ত্রীকে সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া ওয়ারিশদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ছেলের নিতে না চাওয়ার কোন মূল্য নেই।

তবে এত বছর যেহেতু ছেলের স্ত্রীকে গহনাগুলো দেওয়া হয়নি, তাই এগুলো তার কর্তৃত্বে আসেনি। আর যাদের হাতে এগুলো রক্ষিত ছিল তারাও এগুলোর মালিক ছিল না। ফলে এগুলোর যাকাত কারো উপরই ওয়াজিব হয়নি। এখন যদি ছোট ছেলের স্ত্রীকে এগুলো হস্তান্তর করা হয় তাহলে ছোট ছেলের স্ত্রী এগুলোর মালিক হবেন এবং তার উপর যাকাতের দায়িত্ব আসবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৬৪৯, বাদায়িউস সানায়ে ২/১০)

পণ্য দিয়ে যাকাত আদায়

প্রশ্ন : অনেকে যাকাতের টাকা না দিয়ে কাপড় বা লুঙ্গি বা অন্য কোন অসবাব দেয় কিন্তু টাকা দিলে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে পারে। এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা কি হতে পারে? শাড়ী কাপড়, লুঙ্গি বা অন্য কোন আসবাব দেওয়া কি যুক্তি সঙ্গত?

উত্তর : টাকা দিয়ে যাকাত আদায় করলে যেহেতু প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে খরচ করা যায় তাই টাকা দিয়ে যাকাত আদায় করা ভালো এবং সহজও বটে। তবে এটা আবশ্যকীয় কোন বিষয় নয়। টাকা না দিয়ে শাড়ী কাপড়, লুঙ্গি বা অন্য কোন আসবাব দ্বারা আদায় করলেও যাকাত আদায় হয়ে হয়ে যাবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে অন্য আসবাব যেন ঐ টাকার সমমূল্যের হয়। (ফাতাওয়া শামী ২/২৮৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/১২, ১৩, ফিকহুয যাকাত; পৃষ্ঠা ৫৪১)

চেকের মাধ্যমে যাকাত আদায়

প্রশ্ন : আমি আমার ছোটভাইয়ের মেয়েকে যাকাত বাবদ বড় অংকের টাকার একটি চেক দিয়েছি আনুমানিক ছয় বৎসর পূর্বে। উক্ত টাকা আমি আমার নামে আমানত হিসেবে এফ.ডি. আর করে রেখেছি। উক্ত টাকার লাভ আমি আমার ভাতিজীকে প্রতি মাসে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে দিয়েছি। দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ আমার ভাতিজী উক্ত টাকা ভোগ করছে এবং তার যাকাত প্রদান ও কুরবানী আদায় করছে। এখনো উক্ত টাকা আমার কাছে আমানত হিসেবে আছে। এমতাবস্থায় আমি জানতে পারলাম যে, কোন শর্ত দিয়ে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হয় না। (যাকাত প্রদানের সময়

আমি তাকে বলেছিলাম, তোমাদের সংসারের সাহায্যের জন্যই উক্ত টাকা তোমার নামে দিলাম। তাই তোমার বাবার টাকার প্রয়োজন হলে টাকাগুলো তোমার বাবাকে দিয়ে দিবে। এখন আমার কাছে আমানত হিসেবে রাখলাম, যাতে তোমরা চাইবামাত্র উক্ত টাকা পেতে পারো।) বর্তমানে আমি ঐ টাকা আমার ভাতিজীকে দিতে ইচ্ছুক না বা দিবো না। অন্য কাউকে দেওয়ার ইচ্ছা করছি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমার ভাই ভাতিজী খুবই গরীব। তাই উপরে উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দলিলসহ জানানোর আবেদন রইল।

১. আমার ভাতিজীকে দেওয়া চেক যা আমার কাছে আমানত হিসেবে আছে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে কি না?

২. উক্ত টাকা আমার ভাতিজীকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিলে তার হক নষ্ট হবে কি না?

৩. উক্ত টাকা আমার ভাতিজীকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিলে আমি তার কাছে ঋণী থাকবো কি না?

৪. উক্ত টাকা আমার ভাতিজীকে দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৫. উক্ত টাকা আমার ভাইকে দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : চেকের মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে যতক্ষণ পর্যন্ত যাকাতগ্রহীতা চেক নগদ টাকায় রূপান্তর না করবে, যাকাত আদায় হবে না। আর যদি চেককে নগদ ক্যাশে রূপান্তর করে হস্তগত করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নের বর্ণনা মতে আপনি যেহেতু আপনার ভাতিজীকে চেক প্রদান করে তা নগদ টাকায় রূপান্তর করে হস্তগত করার আগেই আপনি তার কাছ থেকে চেক নিয়ে আপনার একাউন্টে রেখে দিয়েছেন। তাই আপনার যাকাত আদায় হয়নি এবং আপনার ভাতিজীও যাকাত বাবদ দেওয়া ঐ চেকের মালিক হয়নি। তাই সেটা আপনি চাইলে তাকে না দিয়ে আপনার ভাই বা অন্য কাউকে দিতে পারবেন। এতে তার হক নষ্ট করা হবে না এবং আপনি তার কাছে ঋণীও থাকবেন না। তবে যদি সে যাকাত গ্রহণের যোগ্য তথা ঋণমুক্ত অবস্থায় প্রায় ৬০,০০০/- টাকার বা নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৬০,০০০/- টাকা মূল্যমানের কোনো সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে তাকে একেবারে বঞ্চিত না করে কিছু দেওয়া ভালো। কারণ ইতিপূর্বে আপনি তাকে দেওয়ার কথা বলেছিলেন, যদিও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করার কারণে সে ঐ চেকের মালিক হয়নি। কিন্তু সে তো নিজের টাকা মনে করে কয়েক বছর যাবত ঐ টাকার যাকাত আদায় করছে ও কুরবানী আদায় করছে। তাই তাকে না দিয়ে যাকাতযোগ্য অন্য কাউকে দিলে যদিও যাকাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য, যাকাতযোগ্য কোনো একজনকে একসঙ্গে এ পরিমাণ অর্থের মালিক বানানো মাকরূহ যার দ্বারা সে নেসাবের মালিক হয়ে যায়। আর বর্তমানে নেসাব হলো ঋণমুক্ত অবস্থায় নূন্যতম ৬০,০০০/- টাকা। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩২৭, ইলেকট্রনিক কারোবার কে শরঈ যাওয়াবিত ওয়া আহকাম; পৃষ্ঠা ৬৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৪৬)

প্রশ্ন : চেকের মাধ্যমে যাকাত দিয়ে আবার সেই চেকই পাওনা বাবদ ফেরত নিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : চেকের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে সেই চেকই পাওনা বাবদ ফিরিয়ে নিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা চেকের মাধ্যমে যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য চেক ভাঙ্গিয়ে নগদ অর্থের মালিক হওয়া শর্ত। সুতরাং যখন সে তা ভাঙ্গিয়ে টাকায় রূপান্তর করে হস্তগত করবে তখন দাতার যাকাত আদায় পূর্ণ হবে; এর পূর্বে নয়। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৫১৫, ইলেকট্রনিক কারোবার কে শরঈ যাওয়াবিত ওয়া আহকাম; পৃষ্ঠা ৬৮)

দুধমাতাকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন : দুধমাতাকে যাকাত দেওয়ার হুকুম কী? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : দুধমাতা যদি যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। কারণ দুধের সম্পর্ক শুধু বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাকাতের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৬, যাকাত কে মাসাইল কা ইনসাইক্লোপিডিয়া; পৃষ্ঠা ১৯৫)

অনুপযুক্তকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : আমি অনেক দিন যাবত একটি পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। এক পর্যায়ে ঐ পরিবার প্রধানকে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মনে করে যাকাতের কিছু টাকাও আমি তাকে দান করি। এখন আমার মনে হচ্ছে, সে একজন ধনী মানুষ– যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয়। আমার প্রশ্ন হলো, আমার ঐ যাকাত আদায় হয়েছে কি না? আদায় না হলে যাকাতের ঐ টাকা আবার আদায় করতে হবে কি না? সঠিক সমাধান জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার সময় যদি আপনি সাধ্যমত যাচাই-বাছাই করে থাকেন যে, সে ধনী কি গরীব। অতঃপর প্রবল ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো যে, সে একজন গরীব মানুষ– যার দরুন আপনি তাকে যাকাত দিয়েছেন। কিন্তু পরে জানা গেল– বাস্তবে সে ধনী, তবে আপনার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। তবে যদি আপনি সাধ্যমত যাছাই না করে থাকেন; বরং শুধুই ধারণার ভিত্তিতে তাকে যাকাত দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার যাকাত আদায় হয়নি। সেক্ষেত্রে আপনাকে পুনরায় সেই পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৮৪, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৩১, আল-ইখতিয়ার ১/১৯৮, ফাতাওয়া শামী ২/২৫৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭২১)

যাকাতের টাকা চুরি হলে করণীয়

প্রশ্ন : আহসান হাবীব সাহেব তার যাকাতের অর্থ আদায় করতে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পকেটমারদের দ্বারা যাকাতের পুরো অর্থটাই চুরি হয়ে যায়। এখন তার করণীয় কী? তার যাকাত কি আদায় হয়ে গেছে? না পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে? আদায় করতে হলে কতটুকু সম্পদের আদায় করবে? চুরি হয়ে যাওয়া সম্পদ সহ না তা ব্যতীত? দলীলসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : যাকাতের টাকা যাকাতের উপযুক্ত গরীবের হাতে কিংবা তার প্রতিনিধির হাতে মালিক বানিয়ে পৌঁছানোর পূর্বে চুরি হয়ে গেলে তাতে যাকাত আদায় হবে না। কাজেই চুরি যাওয়া সম্পদ ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৭০, ফাতাওয়া কাযীখান (হিন্দিয়ার টীকায়); পৃষ্ঠা ২৬৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/৩৬৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৮৫)

রমাযানের জরুরী মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

চাঁদ দেখার মাসাইল

বিমান বা হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা

বিমান থেকে যেখানে চাঁদ দেখা গেছে, নিচে নেমে যদি ভূমি থেকে সেখানেই চাঁদ দেখা যায়, তাহলে শরয়ীভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিমানে করে এ পরিমাণ উঁচুতে চড়ে চাঁদ দেখা হয় যে, সেখানে উদয়স্থল পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ঐ খবর মানার দ্বারা মাস ২৮ দিনে হওয়া আবশ্যক হয় তাহলে বিমানে চড়ে দেখা চাঁদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে যদি হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা হয় এবং ঐ চাঁদ ভূমি থেকে না দেখা যায় তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হেলিকপ্টার খুব বেশি উঁচুতে উড্ডয়ন করে না। কাজেই হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা কোন উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখার মতো। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৮, আল-উরফুশ শাযী শরহু সুনানিত তিরমিযী ২/১৪৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮১)

চাঁদ দেখার ব্যাপারে রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদির খবরের বিধান

যদি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক বা শরয়ী হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে রেডিও, টেলিভিশনে চাঁদ দেখার ঘোষণা করা হয় এবং তার সত্যতার প্রবল ধারণা হয় তাহলে তা এতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে যেখানে তা মেনে নিলে মাস ২৯ দিন থেকে কম অথবা ৩০ দিন থেকে বেশি হওয়া আবশ্যক না হয়।

এমনিভাবে টেলিফোন বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে যদি খবর এমনভাবে পৌঁছায় যে, তার উপর ইয়াকীন হয়ে যায়, তাহলে সেই খবর গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৬, ৩৯০, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৫৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮৫, ২৮৬)

চাঁদ দেখার ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়ার হুকুম

যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তওবা করে না কিংবা সগীরা গুনাহ বারংবার করে তাকে ফাসেক বলে। সুতরাং এমন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার সাথে সাথে যদি তার কথাবার্তা, মু'আমালাত শরীয়ত অনুযায়ী না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কথাবার্তা, মু'আমালাত শরীয়ত অনুযায়ী হয়, তাহলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (সূরা তালাক-২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৯৪৬৯, ২১৭৪৩, আল-হিদায়া ১/১১৯, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৫, ফাতাওয়া কাযীখান ৮/৩৩২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮৭)

সৌদি আরবে দেখা চাঁদ আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট নয়

জেনে রাখা উচিত, চাঁদের একটি কুদরতী আবর্তন ব্যবস্থা রয়েছে এবং মাসের প্রত্যেক দিনের জন্য একটি নির্ধারিত মনযিল রয়েছে। আর লম্বা ও চওড়ার দিক দিয়ে প্রত্যেক শহরের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উদয়স্থলের এ ভিন্নতা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কিনা?

এ বিষয়ে সমস্ত ফিকহী আলোচনার সারমর্ম হলো,

(ক) নিকটবর্তী শহরগুলোতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। নিকটবর্তীর সীমা হলো, যেখানকার খবর গ্রহণ করলে মাস ২৯ দিন থেকে কম বা ৩০ দিনের বেশি হয় না।

(খ) দূরবর্তী শহরগুলোতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। আর দূরবর্তীর সীমা হলো, যেখানকার খবর গ্রহণ করলে মাস ২৯ দিন থেকে কম বা ৩০ দিনের বেশি হয়ে যায়। অতএব সে স্থানের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হবে না; তা যতই নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছুক না কেন। কেননা শরীয়তে কোন মাস ২৯ দিন থেকে কম এবং ৩০ দিনের বেশি হয় না।

উল্লিখিত দু'টি আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, সৌদি আরবে দেখা চাঁদ আমাদের দেশের জন্য ধর্তব্য হবে না, চাই তা যতই নির্ভরযোগ্য হোক না কেন। কেননা সেখানকার উদয়স্থল এখানকার থেকে ভিন্ন এবং সেখানখার খবর মানার দ্বারা আমাদের দেশের উদয়স্থল হিসেবে মাস কম বা বেশি হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৮৭, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৮, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৩২)

যেখানে ৬ মাস দিন/রাত থাকে সেখানে চাঁদ দেখার বিধান

যেখানে উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা ৬ মাস দিন/রাত থাকে সেখানে মাস নির্ধারণ করবে আশপাশের যেখানে চাঁদ দেখা যায় সেখানকার হিসেবে হিসেব করে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪৯)

রমাযান মাস ৩০ দিন পুরা হওয়ার পরেও ঈদের চাঁদ দেখা না গেলে করণীয়

রমাযান মাস ৩০ দিন পুরা হয়ে গেছে, এখনো চাঁদ দেখা যায়নি। তাহলে ঈদের নামায আদায় করে ফেলবে; ৩১তম রোযা রাখবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৩৩)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষীর সংখ্যা

যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে রমাযানের জন্য একজন দ্বীনদার মুসলমান পুরুষ বা মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঈদের জন্য দুইজন দ্বীনদার মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (তাফসীরে রাযী ৫/২৫৬, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৫, ৩৮৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৭, মা-লা-বুদ্দা মিনহু; পৃষ্ঠা ৯৩)

অসুস্থ ব্যক্তির রোযার বিধান

হায়েয নেফাস-ওয়ালী মহিলার রোযার বিধান

হায়েয নেফাস-ওয়ালী মহিলার রোযা রাখা জায়েয নেই, তবে সুস্থ হলে ঐ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭১ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

মুস্তাহাযা মহিলার রোযার বিধান

মুস্তাহাযা (রোগের কারণে যোনিদ্বার দিয়ে রক্ত ঝরা) মহিলার রোযা রাখতে কোন সমস্যা নেই। (কিতাবুল মাবসুত ১/১৭৮ মাজমাউল আনহুর ১/৫৬ কিতাবুল মাসাইল ১/২৩১)

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস বন্ধ হলে রোযা রাখার বিধান

যদি কোন মহিলা দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হয় তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখবে না। তবে রোযাদারদের মত খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে ঐ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৮, আত্তাজরীদ ৩/১৫১৫ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৯)

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা রাখার বিধান

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা এমনিই ভেঙ্গে যাবে। তবে পরে ঐ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। এমন মহিলার জন্য রোযাদারের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জরুরী নয়। তবে সে রোযাদারের সামনে খানা-পিনা করবে না বরং আড়ালে গিয়ে খাবে। (আল জাওহারাতুন নায়্যিরা ১/১৪৪ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৭/২৬২)

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা বমি হলে তার বিধান

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা বমি হলে রোযা ভাঙ্গবে না, চাই বমি বেশি হোক অথবা কম হোক। (আল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদ্বীনা ১/৩৯৪, ফাতাওয়া শামী ২/৪১৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৬)

রোযা অবস্থায় বমি করার কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে যদি খানা খেয়ে ফেলে তাহলে ঐ রোযার বিধান

এই ব্যক্তির খানা খাওয়ার কারণে রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে। এ কারণে শুধু রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪১ মাজমাউল আনহুর ১/২৪৩ ইমদাদুল ফাতাওয়া জাদীদ ৪/২৬১)

রোযা রাখলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে রোযা রাখার বিধান

রোযা রাখলে যদি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে এখন রোযা না রেখে পরে শুধু কাযা করলেই হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩৯ আল ইখতিয়ার ১/১৩৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৬)

বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির রোযার বিধান

বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখবে না, বরং ফিদিয়া দিয়ে দিবে। (আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ৪/৮৩, কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

পাগলের রোযার বিধান

যদি পুরা রমাযান মাস পাগল থাকে তাহলে রোযার কাযা-কাফফারা কিছুই লাগবে না। আর যদি রমাযান মাসে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে পাগলামীর কারণে যতগুলো রোযা রাখতে পারেনি সবগুলোর কাযা আদায় করতে হবে। (বিনায়া শরহে হিদায়া ৪/৯৫ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

বেহুশ অবস্থায় রোযা রাখার বিধান

যে দিন বেহুশ হয়েছে ঐ দিন ছাড়া বাকি যত দিন বেহুশ ছিল ততদিনের রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (বিনায়া শরহে হিদায়া ৪/৯৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

রোযা অবস্থায় দাঁত ফেললে তার বিধান

দাঁত ফেলার কারণে রোযা ভাঙবে না। তবে যদি রক্ত মুখ থেকে গলার মধ্যে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬ আন্নাহরুল ফায়িক্ব ২/১৮ কিতাবুল মাসাইল ২/১৫৫)

রোযা অবস্থায় কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে রোযার বিধান

রোযা অবস্থায় কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-মাবসুত ৩/৫৭ তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৩ কিতাবুল মাসাইল ২/১৫৫)

রোযা অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হলে রোযার বিধান

নাক থেকে রক্ত বের হওয়ার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না। তবে রক্ত যদি মুখ দিয়ে গলার মধ্যে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (মাজমাহুল আনহুর ১/৩৬১ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৩)

রোযা অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ

ঔষধের ঘ্রাণ গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ

রোযা অবস্থায় শুধুমাত্র ঔষধের ঘ্রাণ নেয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৭২)

গরম পানিতে ঔষধ ঢেলে ঔষধের ভাপ টেনে নেয়া

যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি গরম পানির সাথে ঔষধ মিশিয়ে তার ভাপ বা মেশিনের সাহায্যে ঔষধ মিশ্রিত ভাপ মুখ বা নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এটাকে যদি বাতাসের পর্যায়েও ধরা হয় তাহলে ঔষধ মিশ্রিত হওয়ার দরুন তা ধোঁয়ার হুকুমে হবে, যা ইচ্ছাকৃত টেনে নিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এছাড়া ভাপের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকে, যার কারণে এটাকে জলীয় বাষ্প বলা হয়। তাই রোযা ভেঙ্গে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। (আল-মাবসূত ৩/৯৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, ফাতাওয়া শামী ২/৪০৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৭)

ইনহেলার (INHALER) ব্যবহার করা

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের ব্যাপারে কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এর মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গে না, তবে সতর্কতা হলো রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এটা ব্যবহারের মাধ্যমে যদিও মনে হয় যে, শুধু বাতাস পেটে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো ঔষধের কিছু অংশও পেটে যায়, যদিও তা সামান্য। এর প্রমান হল, যদি ইনহিলার কোন কাঠ বা কাগজে স্প্রে করা হয় তাহলে ঐ অংশ ভিজে যায় এবং একটা আবরণ পড়ে, যার দ্বারা বুঝা যায়, এটা দেহবিশিষ্ট বস্তু, যা পেটে প্রবেশ করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। সুতরাং রোযা অবস্থায় বাধ্য হয়ে কেউ ইনহেলার ব্যবহার করলে পরবর্তীতে এ রোযা কাযা করে নিবে। আর আজীবন ইনহেলার ব্যবহারকারী হলে রোযার ফিদিয়া প্রদান করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪০৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৬০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৬)

অক্সিজেন মাস্ক (OXYZEN MASK) ব্যবহার করা

অক্সিজেন মাস্ক লাগানোর মাধ্যমে যদি বাতাস ছাড়া অন্য কিছু পেটে বা গলায় প্রবেশ না করে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ বাতাস দেহবিশিষ্ট বস্তু নয়, আর রোযা ভাঙ্গার জন্য দেহবিশিষ্ট কোন জিনিস শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা জরুরী। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৭৯)

নাকে ড্রপ বা ঔষধ ব্যবহার করা

রোযাদার ব্যক্তি যদি অসুস্থতার দরুন নাকে ড্রপ ব্যবহার করে আর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা টেনে নেয়ার মাধ্যমে কণ্ঠনালীর নিচে বা মস্তিষ্কে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪০২, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৬৮)

চোখে ড্রপ ব্যবহার করা

রোযা রেখে চোখে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। যদিও ঔষধের তিক্ততা বা স্বাদ গলায় অনুভূত হয়। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৩, আল-বিনায়া ৪/৭১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৮৩)

কানে ড্রপ বা তেল ব্যবহার করা

কানে ড্রপ বা তেল ব্যবহার করার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও উলামায়ে কেরামের এ ফতোয়ার উপর আমল করার মধ্যেই অধিক সতর্কতা যে, এর দ্বারা রোযা

ভেঙ্গে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। (আল-হিদায়া ১/১২৩, বাদায়িউস সানায়ে ২/৯৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৮৫)

মুখ গহ্বরে ঔষধ ব্যবহার

রোযা অবস্থায় শুধুমাত্র মুখের গহ্বরে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয় না, যতক্ষণ না ঐ ঔষধ কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে। কেননা রোযা নষ্ট হওয়ার জন্য সরাসরি প্রবেশপথ তথা মুখ, নাক, পায়খানার রাস্তা ইত্যাদি দ্বারা কোন জিনিস পেটে প্রবেশ করা শর্ত। যেমন: লোমকূপ বা চামড়ার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কোন ঔষধ বা পানীয় প্রবেশ করার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না। আর মুখের ভেতরের অংশ রোযার ক্ষেত্রে বাইরের অংশের হুকুমে, ফলে কুলি করা বা কোন জিনিসের স্বাদ অনুধাবনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯৮)

নাইট্রোগ্লিসারিন (NITROGLYCERINE)

নাইট্রোগ্লিসারিন হচ্ছে হার্টের রোগীদের ঔষধ বিশেষ, যা জিহ্বার নিচে ২/৩ ফোঁটা ব্যবহার করে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। এতে ঐ ঔষধটি শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, ঔষধ শুধুমাত্র শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মেশার দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করার পর গিলে না ফেলা হয়। যদি না গিলে থুথুর সাহায্যে বাইরে ফেলে দেয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯৮)

দাঁত উঠানো

দাঁত উঠানোর কারণে রোযার ক্ষতি হবে না। তবে রক্ত যদি ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক গলা দিয়ে ঢুকে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৪০, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৮৪)

এন্ডোস্কপি (ENDOSCOPY)

একটি সরু পাইপ যার মাথায় বাল্ব লাগানো থাকে, গলা দিয়ে পেটে প্রবেশ করানো হয়। পাইপটির অপর প্রান্তে থাকা মনিটরের সাহায্যে পেটের আভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করা হয়, একে এন্ডোস্কপি বলা হয়। এ পরীক্ষার শরয়ী বিধান হলো, যদি এর মাথায় কোন জেল লাগানো না থাকে তাহলে এর মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩০০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭)

মস্তিষ্কের অপারেশন

অপারেশন যদি মস্তিষ্কের এমন স্থানে হয় যেখান থেকে গলার কোন রাস্তা নেই তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। সাধারণত মস্তিষ্কের অপারেশন বলতে এটাকেই বুঝায়। তাই মস্তিষ্কের অপারেশনের কারণে রোযা ভাঙবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম দেমাগ তথা মস্তিষ্কে কিছু প্রবেশ করার কারণে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। কারণ হচ্ছে, আগে ধারণা করা হতো, মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত কোন রাস্তা বা ছিদ্রপথ আছে। আর এটা মনে করার কারণ সম্ভবত সর্দি লাগলে উপর থেকে শ্লেষ্মা বের হওয়া। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণামতে শ্লেষ্মার স্থান আর মস্তিষ্ক মূলত ভিন্ন। তাই মস্তিষ্কের অপারেশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো রোযা ভাঙ্গবে না। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানী। (আল-ইনায়া ২/৩৪২, আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ ১/১৪১)

ইঞ্জেকশন (INJECTION), ইনসুলিন (INSULINE), বা টিকা নেয়া

রোযা অবস্থায় ইঞ্জেকশন, ইনসুলিন বা টিকা নেয়া যাবে, এ কারণে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, ফাতাওয়া শামী ২/৪১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৮০)

স্যালাইন নেয়া

রোযা অবস্থায় স্যালাইন নিলে রোযা ভাঙ্গে না। যদিও এর মাধ্যমে শারীরিক শক্তি লাভ হয়। (আল-হিদায়া ১/১২০, ফাতাওয়া ২/৩৯৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৮২)

রক্ত দান ও গ্রহণ

রক্ত দেয়া-নেয়া উভয়টিই রোযাদারের জন্য জায়েয। কেননা রক্ত দেয়া-নেয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৪০, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, মাসাইলে রোযা; পৃষ্ঠা ১৩৭)

ডায়ালাইসিস করা (DIALYSIS)

ডায়ালাইসিস সাধারণত দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতি হলো, শরীরের সমস্ত রক্ত একটি নলের সাহায্যে মেশিন টেনে নেয় এবং আরেকটি নল দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণত এ পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে, শরীরের চামড়া কেটে তাতে থলে জাতীয় একটি জিনিস রেখে দেয়া হয় এবং থলেটি যে পাইপের মাথায় থাকে তার মুখ বাইরে থাকে। আর ঐ পাইপের মাধ্যমে থলের মধ্যে ঔষধ রেখে দেয়া হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঐ কেমিক্যাল রক্তের বিষাক্ত পদার্থ নিজের মধ্যে টেনে নেয়। অতঃপর ১২ ঘণ্টা পর ঐ ঔষধ ফেলে দিয়ে নতুন ঔষধ দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল হওয়ায় খুব কম প্রচলিত। ডায়ালাইসিসের এ উভয় পদ্ধতিতে যেহেতু রোযা ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায় না, কাজেই রোযাদার ব্যক্তির ডায়ালাইসিস করাতে কোন সমস্যা নেই। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৯৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯০)

এনজিওগ্রাম (ANGIOGRAM)

এনজিওগ্রাম হচ্ছে হার্টের বিশেষ পরীক্ষা। যখন কারো হার্টের রক্তনালী ব্লক হয়ে যায়, তখন উরুর গোড়ার দিকে কেটে একটি শিরার ভেতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে (যা হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে) পরীক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রে নলের মাথায় কোন মেডিসিন লাগানো থাকলেও রোযার কোন সমস্যা হবে না, কারণ নলটি শরীরের কোন গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে পৌঁছে না। (আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া শামী ২/২৯৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩)

সাপোজিটরি (SUPPOSITORY) বা ডুস (DOUCHE) ব্যবহার করা

সাপোজিটরি বা ডুস ব্যবহারের কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, তাবয়ীনুল হাকাইক ১/৩২৯, কিফায়াতুল মুফতী ৪/২৩৯)

অর্শ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বর্ধিত গোশত ভেতরে প্রবেশ করানো

অর্শ রোগী যদি বর্ধিত অংশ মলদ্বারের ভেতরে ঢুকানোর জন্য পানি, তেল, বা ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং উক্ত পানি, তেল বা ঔষধ ডুস-এর স্থান পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না, পৌঁছে গেলে ভেঙ্গে যাবে। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৭৬, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৫০২)

পুরুষের জন্য পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ব্যবহার করা

পুরুষের লজ্জাস্থানের ভেতর ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ পেট ও মুত্রথলির মাঝে এমন কোন সরাসরি ছিদ্রপথ নেই যার মাধ্যমে ঔষধ পেটে প্রবেশের সুযোগ থাকে। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩, আল-বিনায়া ৪/৬২)

মহিলাদের যোনিতে ঔষধ ব্যবহার করা

মহিলাদের রোযা রেখে লজ্জাস্থানে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ছিল, রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাচীন ধারণামতে মুত্রথলি ও পেটের মাঝে সরাসরি রাস্তা আছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত হলো,এ দুইয়ের মাঝে সরাসরি কোন রাস্তা নেই। কারণ প্রশ্রাব মূলত মুত্রথলিতে পেট থেকে জমা হয় না বরং নিঃসৃত হয়। আর রোযা ভাঙ্গার জন্য শর্ত হলো গ্রহণযোগ্য কোন রাস্তা দিয়ে কিছু প্রবেশ করা। কাজেই মহিলাদের যোনিতে ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩, আল-বিনায়া ৪/৬২)

ঔষধের মাধ্যমে মাসিক বন্ধ রেখে রোযা রাখা

যদি কোন মহিলা ঔষধের মাধ্যমে মাসিক বন্ধ রাখে তাহলে তাকে সুস্থ বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে রোযা রাখতে হবে। তবে এমনটি করা অনুচিৎ, কারণ এতে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭০)

সিস্টোস্কপি (CYSTOSCOPY)

সিস্টোস্কপি অর্থাৎ পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার লাগালে রোযা ভাঙবে না। কারণ এটা পাকস্থলী বা গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানে পৌঁছে না বরং এটা মুত্রথলিতে গিয়ে প্রস্রাব বের হওয়া সহজ করে দেয়। আর মুত্রথলি রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য স্থান নয়। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩)

গর্ভপাত (Abortion) (ক) M.R (খ) D and C

Abortionগর্ভপাত দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, বাচ্চার কোন অঙ্গ বা আকৃতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করা, যাকে Manstrual Regulation বা মাসিক নিয়মিতকরণ বলা হয়। এর সংক্ষিপ্ত রূপ M.R। গর্ভপাতের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, বাচ্চার কোন আকৃতি প্রকাশ হওয়ার পর গর্ভপাত করা। একে Dialation And Curettage বলা হয়। এর সংক্ষিপ্ত রূপ D and C। উল্লিখিত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভপাতের দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। প্রথম পদ্ধতিতে ভাঙ্গার কারণ হচ্ছে, যেহেতু বাচ্চার কোন অঙ্গ প্রকাশ পায়নি তাই ঐ গর্ভপাতের সময় বের হওয়া রক্ত হায়েয (ঋতুস্রাব) হিসেবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু বাচ্চার আকৃতি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই ঐ সময় বের হওয়া রক্ত নেফাস (গর্ভস্রাব) বিবেচিত হবে। আর হায়েয বা নেফাস উভয়টি শুরু হওয়ার মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে যায়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭০)

কপার-টি (COPER-T)

কপার-টি হলো যোনিদ্বারে প্লাস্টিক স্থাপন করা, যাতে সহবাসের সময় বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ না করে। যোনিদ্বারে কেবল উক্ত প্লাস্টিক স্থাপন করার মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয় না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা বা খালি জায়গা কোনটিই নয়। তবে রোযা রেখে এটা ব্যবহার করে সহবাস করলে রোযার কাযাও করতে হবে, কাফফারাও দিতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, আল-বিনায়া ৪/৬৫, দুরারুল হুক্কাম ১/২০৩)

প্রক্টোস্কপি (PROCTOSCOPY)

প্রক্টোস্কপি অর্থাৎ অর্শ, পাইলস, ফিষ্টুলা ইত্যাদি রোগের পরীক্ষা। এর নিয়ম হচ্ছে, মলদ্বার দিয়ে একটি নল ঢুকানো হয় যাতে গ্লিসারিন জাতীয় পিচ্ছিল বস্তু ব্যবহার করা হয়। এটা নলের সাথে লেপ্টে থাকে। ফলে রোগীর কষ্ট কম হয়। যদিও ডাক্তারদের মতানুসারে ঐ পিচ্ছল বস্তুটি নলের সাথে লেগে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে ভিতরে থেকে যায় না, আর থাকলেও পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে, তবুও ঐ বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে অবস্থানের কারণে রোযা ভেঙ্গে যাবে। ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৮)

ল্যাপারস্কপি বায়োপসি (LAPAROSCOPY-BIOPSY)

মেশিনের সাহায্যে পেট ছিদ্র করে ভেতরের কোন অংশ বা গোস্ত পরীক্ষার জন্য বের করে আনার নাম ল্যাপারস্কপি। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি মেশিনের মাথায় কোন ঔষধ লাগানো থাকে আর তা পাকস্থলীতে রয়ে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩০০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭)

সিরোদকার অপারেশন (SHIRODKAR OPERATION)

সিরোকদার অপারেশন হচ্ছে, অকাল গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুর্দিকে সেলাই করে মুখকে খিঁচিয়ে রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। আর এর মাধ্যমে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৯৩, আল-বিনায়া ৪/৬৫, দুরারুল হুক্কাম ১/২০৩)

রোযা ভেঙ্গে যাওয়া ও কাযার বিধান

রোযা অবস্থায় আগরবাতি বা কোন সুগন্ধি জাতীয় জিনিস জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নাক বা মুখ দিয়ে তার ধোঁয়া টেনে নিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এই রোযার কাযা করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১০৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৭০)

রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে সামান্য পানি অনিচ্ছাকৃত পেটে চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া শামী ২/৪০১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬৬)

রোযা অবস্থায় ঢেঁকুর আসলে পেট থেকে কিছু খাবার মুখে বা কণ্ঠনালীতে চলে আসে। এই খাবার ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৬৬, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ৪৪৭)

রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করলে দাঁত থেকে বের হওয়া রক্ত যদি থুথু সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, এটা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬৫, ৪০৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৮)

রোযা অবস্থায় মশা-মাছি অনিচ্ছাকৃত পেটে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৭)

রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে বা অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভাঙবে না। তবে ইচ্ছাকৃত বমি করলে এবং সেটা মুখ ভরা পরিমাণ হলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৩৮০, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৭২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৮)

রমাযানের কাফ্‌ফারার মাসাইল

রমাযানের কাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি

রমাযানের কাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি দু'টি–

এক. শরয়ী কোন ওযর ব্যতীত রমাযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে

খাদ্য বা খাদ্যজাতীয় কোন কিছু গ্রহণ করা।

দুই. সহবাসের মাধ্যমে মনের খাহেশাত পূর্ণ করা। সুতরাং যদি কেউ রমাযানের রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানা-পিনা করে কিংবা সহবাস করে তাহলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী; হা.নং ৮০৫৪, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ ১/৫০৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪১০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০১)

রোযার কাফ্ফারা

রোযার কাফ্ফারা হলো, লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা যার মাঝে রমাযান, ঈদ ও আইয়্যামে তাশরীক (ঈদুল আযহার পরবর্তী ৩ দিন) না হতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো বা ৬০টি সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (সূরা মুজাদালাহ- ৩-৪, সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ২৩০৬, ফাতাওয়া শামী ২/৪১২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০২)

একটি কাফ্ফারা কয়েকজনকে কিংবা কয়েকটি কাফ্ফারা একজনকে দেয়ার বিধান

একই কাফ্ফারা কয়েকজনকে দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে একাধিক কাফ্ফারাও একজনকে দেয়া যাবে। তবে একজনকে একদিনে একাধিক কাফ্ফারা দিলে একদিনেরটাই আদায় হবে। অতিরিক্তটুকু নফল হিসেবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫৬৭, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৭৮, আলবাহরুর রায়িক ৪/১১৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০২)

কাফ্ফারার রোযা আদায়কালে হায়েয, নেফাস অথবা অন্য কোন কারণে রোযা ভঙ্গ করার বিধান

কাফ্ফারার রোযা লাগাতার দুই মাস রাখা আবশ্যক। হায়েয ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি একটি রোযাও ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে পুনরায় লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫১২, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৭৬, ২/৪১২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৫৫)

কাফ্ফারার রোযার নিয়ত কখন করবে?

কাফ্ফারার রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বেই করতে হবে। পরে নিয়ত করলে রোযাটি কাফ্ফারা হিসেবে আদায় হবে না। (কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ ১/৪৯৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৫৮, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮০)

ই'তিকাফের মাসাইল

ই'তিকাফের পরিচয় ও প্রকারভেদ

ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকেক ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ তিন প্রকার– ১. মান্নতের কারণে ওয়াজিব ই'তিকাফ। ২. রমাযানের শেষ দশ দিনের সুন্নাত ই'তিকাফ। ৩. নফল ই'তিকাফ, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৮৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৫)

জামা'আত হয় না এমন মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান

ইমাম মুয়াযযিন নির্ধারিত আছে এমন মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ হবে, যদিও তাতে নিয়মিত জামা'আত না হয়। এমনটি হলে ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ অবস্থায় কমপক্ষে একজনকে সাথে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৭)

এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকাবস্থায় শুধুমাত্র এক মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান

ই'তিকাফ হলো মহল্লাভিত্তিক ইবাদত। সুতরাং এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকলে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায় করার দ্বারা পুরো মহল্লাবাসীর ই'তিকাফ আদায় হয়ে যাবে। তবে সম্ভব হলে সব মসজিদেই ই'তিকাফ করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫, মাজমাউল আনহুর ১/৩৭৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫০৮)

মসজিদ থেকে ভুলে বের হয়ে গেলে ই'তিকাফের হুকুম

মসজিদ থেকে ভুলে বের হলেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৫০৭)

মসজিদের বারান্দার হুকুম

মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করার সময় যদি বারান্দা মসজিদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে তা মসজিদের হুকুমে হবে, নতুবা মসজিদের হুকুমে ধরা হবে না। কজেই মসজিদ কমিটি মসজিদের শুরু কোত্থেকে তা ঘোষণা করে দিবে, বা দেয়ালে লিখে দিবে। (ফাতাওয়া শামী ৪/৩৫৮, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫১১, ফাতাওয়া দারল উলূম দেওবন্দ ৬/৫০৭)

অসুস্থতার কারণে রমাযানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ ভঙ্গ করার হুকুম

উল্লিখিত অবস্থায় নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী যে দিন ই'তিকাফ ভঙ্গ করেছে শুধুমাত্র সেদিনের ই'তিকাফ রোযাসহ কাযা আদায় করবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৪৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৯৫, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/১৩০)

নফল উযূ বা জুমু'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য বের হওয়ার বিধান

নফল উযূ বা জুমু'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। (আল-ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার ১/২২০, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৯৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৭)

বায়ু ত্যাগ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়ার বিধান

নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী বায়ু ত্যাগ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয আছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৬৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৭১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৫)

খাওয়ার জন্য ই'তিকাফকারীর বাড়িতে যাওয়ার বিধান

যদি খানা আনার মত অন্য কোন লোক পাওয়া না যায়, তাহলে ই'তিকাফকারী খাওয়ার জন্য বাড়িতে যেতে পারবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩২৬, ৫২৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/২৮৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭০৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৩১৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৪)

মহিলাদের ই'তিকাফের বিধান

মহিলাদের জন্য ঘরে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। মহিলাদের ই'তিকাফের পদ্ধতি হলো, তারা বাসার নামাযঘরে বা কোন কামরাকে আপাতত নামাযঘর নির্ধারণ করে সে স্থানকে ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে নিবে এবং সেখান থেকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৪৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৯)

গুরুত্ব বিবেচনায় রাবেতার ২৮তম (রমাযান-শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী) সংখ্যার লেখাটি এ সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশ করা হলো। –সম্পাদক

مركز العلوم الشرعية وتربية المسلمين

মারকাযুল উলূম আশ-শারইয়্যাহ ওয়া তারবিয়াতিল মুসলিমীন

ইফতা, তাইসীর, নাযেরা ও হিফজুল কুরআন বিভাগে ভর্তি চলছে!

ইফতা বিভাগ

- জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুফতিগণের দারস প্রদান ও বিশেষ তত্ত্বাবধায়নে ফাতওয়ার তামরিন।
- ব্যাংকিং ও ইকতিসাদ বিষয়ক কর্মশালা ।
- অনলাইন লেনদেন, হালাল ফুড ও আধুনিক নানা বিষয়ে শরয়ী বিশ্লেষণ ।
- বিভিন্ন বিষয়ে মুতাখাসসিস উলামা কর্তৃক মুহাযারা।
- রদ্দে ফিরাকে বাতেলা সংক্রান্ত বিশেষ কর্মশালা ।
- ইংরেজি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- বাৎসরিক ইলমী সফর।
- অসচ্ছল ছাত্রদের বিশেষ সহায়তা ও সালে সানীতে ভাতা প্রদান।

তাইসীর জামাআত

- ঐতিহ্যগত কওমী নেসাবের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক ইত্যাদি সমন্বিত পাঠ্যক্রম।
- সুন্দর হস্তলিপির ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন।
- আরবিতে কথোপকথনের চর্চা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।
- আমাল ও সুন্নাহ এবং তারবিয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ।
- সংশ্লিষ্ট উস্তাদের তত্ত্বাবধায়নে নিয়মিত খেলা-ধুলা, বক্তৃতা ও ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- বার্ষিক শিক্ষা সফর ।
- একবেলা নাস্তাসহ মোট ৪ বেলা স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদান।
- অসচ্ছল ছাত্রদের জন্যে বিশেষ সহায়তা।

হিফজ ও নাযেরা বিভাগ

- কওমি নেসাব ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে বাস্তবসম্মত পাঠ্যক্রম।
- সুন্দর হস্তলিপি ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পাঠদান।
- ছাত্রদের মেধা ও মানসিক বিকাশ এবং সৃজনশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ।
- ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- দ্বিমাসিক শিক্ষা সফর।
- অসচ্ছল ছাত্রদের বিশেষ সহায়তা।
- আমাল ও সুন্নাহ, আদব-আখলাক, উন্নত নৈতিকতা এবং তারবিয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ।
- দুই বেলা নাস্তাসহ মোট ৫ বেলা স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদান।

মুহতামিম: মুফতি ইবরাহীম হাসান দা.বা.

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খলীফা, হযরত শাহ হাকিম আখতার সাহেব রহ.

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য:

১ম ধাপ : ১ রমযান - ২০ রমযান

২য় ধাপ : ৮ শাওয়াল – ২০ শাওয়াল

ইফতা বিভাগে ভর্তির জন্যে, বুখারী-১, হিদায়া-৩, নুরুল আনওয়ার (মৌখিক), মাকালা (লিখিত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
কোটাপূরণ সাপেক্ষে ভর্তি চলবে।

যোগাযোগ: 01965159658 , 01742638815　**ঠিকানা: # বাসা ৬৬১, # রোড ১৪, আদাবর, ঢাকা।**

ফাতাওয়া-মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মুহাম্মাদ তরিকুল ইসলাম
কৃষি মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪১৩ প্রশ্ন : আমি কৃষি মার্কেট বাজার ব্যবসায়ীদের মাসিক সঞ্চয় সমিতিতে কর্মী হিসেবে যোগ দিতে চাচ্ছি। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো হলো, এই সমিতির সদস্যবৃন্দ প্রতিমাসে এক হাজার (১০০০) টাকা করে জমা করে থাকে। প্রথমে শুনেছি, এই টাকাগুলো তারা কোন প্রকার ঋণ বা লোনের জন্য দেয় না। তারা এই টাকাগুলো দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া, জমি, বাড়ি এবং অন্য সব পণ্য ক্রয় করে আবার তার সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় করে। পরবর্তীতে জানতে পারি, তারা কোন ফ্ল্যাটের মালিককে শুরুতে দশ পনের লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে তার থেকে ফ্ল্যাট নেয়। তারপর এই ফ্ল্যাট অন্যদের কাছে ভাড়া দেয় এবং ফ্ল্যাটের মালিককে তারা প্রতি মাসে চার পাঁচশো টাকা করে নামে মাত্র ভাড়া দেয়। এভাবে দিলে নাকি জায়েয হয়, তাই তারা এভাবে করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের অফিসে আমি কাজ করতে চাই।

অতএব, আপনার নিকট জানতে চাচ্ছি, উক্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ আছে কি না? বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

তানকীহ : উত্তর দেওয়ার সুবিধার্থে আমাদের কিছু বিষয় জানার প্রয়োজন। (ক) সমিতির সদস্যগণ যে দশ পনের লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে ফ্ল্যাট নেয়, তা কী হিসেবে নেয়, ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে নেয়? নাকি ভাড়া হিসেবে নেয়? না বন্ধক হিসেবে নেয়? (খ) যদি ভাড়া হিসেবে নেয়, তাহলে ভাড়া চুক্তির নিয়ম-নীতি ও সময়সীমা কী হয়?

জাওয়াবে তানকীহ : (ক) তারা বলে তাদের চুক্তির ধরন হল, তারা ফ্ল্যাটের মালিককে শুরুতে ১০/১৫ লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মালিকের থেকে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়, ভাড়া নির্ধারণ করে চার পাঁচশো টাকা। (খ) ভাড়ার নিয়ম-নীতি হলো, তারা দুই/তিন বছরের জন্য চুক্তি করে। মেয়াদ শেষে ফ্ল্যাটের মালিক অ্যাডভান্স হিসেবে দেওয়া টাকা পরিশোধ করে দিবে। আর ভাড়া গ্রহীতা মালিককে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দিবে।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ভাড়ার চুক্তিতে অ্যাডভান্সের নামে যে টাকা দেওয়া হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণ। আর ঋণ দিয়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উপকৃত হওয়া সুদের নামান্তর।

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুদী কার্যক্রম। কারণ এতে ফ্ল্যাট মালিককে অ্যাডভান্সের নামে মোটা অংকের ঋণ দিয়ে নামে মাত্র ভাড়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে ঋণ দিয়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ভাড়া কম দেওয়ার মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম এবং সুদের অন্তর্ভুক্ত।

আর সুদী কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল, যদি তার কাজটা সরাসরি সুদী লেন-দেন সংক্রান্ত না হয়; বরং সেই প্রতিষ্ঠানের লেন-দেনের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ হয়। যেমন দারোয়ান হওয়া, প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার করা ইত্যাদি। আর তার বেতনও সুদ থেকে না হয়, তাহলে সুদী কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চাকুরির বিনিময়ে প্রাপ্ত বেতন হারাম হবে না। কারণ এতে সরাসরি সুদী কারবারের সহযোগিতা করা হয় না অথবা সুদ থেকে বেতন দেওয়া হয় না। তবে সর্বাবস্থায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করা উচিত।

সুতরাং যদি আপনি লেন-দেন বা হিসেব-নিকাশের কাজে নিয়োগ হতে চান, তা আপনার জন্য জায়েয হবে না। আর যদি দারোয়ান হওয়া, প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজে নিয়োগ হতে চান এবং আপনার বেতনও হালাল টাকা থেকে হয়, তাহলে প্রাপ্ত বেতন অবৈধ হবে না।

(সূরা মায়িদা; আয়াত ২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হাদীস ২০৬৯০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৮, ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৬, ৬/৫৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/২০২, ৪/৪৫০, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২০৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৭/৫৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৫৮, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৯৩, ৩৯৫)

হাফেয আলী হাসান
সৌদিআরব

৪১৪ প্রশ্ন : (ক) আমরা ছোটকালে হিফয বিভাগে পড়াকালীন কুরআন শরীফের পার্শ্বে সাদা খালি জায়গায় দৈনিক সবকের পর কলম দ্বারা চিহ্ন দিয়ে রাখতাম আবার বাৎসরিক বিভিন্ন বন্ধের পর তারিখ, দিন, মাস লিখে চিহ্ন দিয়ে রাখতাম। আবার অনেক কুরআন শরীফ পড়ার জন্য নিলে দেখতাম যে, সেখানে বাংলা, উর্দূ বা আরবীতে অনুবাদ, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা লেখা থাকত।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, উপরোক্ত কাজগুলো শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয আছে কী না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

(খ) আমি সৌদিআরব এক কোম্পানিতে চাকরি করি। আমার ডিউটি হলো রাতে। ডিউটি শেষ হয় রাত ৪টা ৩০ মিনিটে। যেহেতু কিছুক্ষণ পরই ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তাই ডিউটি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যদি ঘুমিয়ে যাই তাহলে ফজরের নামায জামাআতে পড়া কষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য মাঝে মাঝে মনে চায় উমরী কাযাগুলো আদায় করে নিতে; কিন্তু আমি তো জানি সুবহে সাদেকের পর ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া আর কোন নামায নেই; কিন্তু এক ভাই বললেন, সুবহে সাদিকের পর নাকি উমরী কাযাও পড়া যায়।

এক্ষেত্রে শরীয়তের মূল মাসআলাটি কি? জানালে উপকৃত হব।

(গ) খানা খাওয়া ও পেশাব করে কুলুখ নেওয়ার সময় সালাম দেওয়া কি নিষেধ? যদি কেউ এ সময় সালাম দিয়েই দেয় তাহলে উত্তর দেওয়া কি ওয়াজিব? উভয় জাহানে আল্লাহ আপনাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

(ঘ) আমাদের বাড়ির সামনের মেইন গেইটের উপর هذا من فضل ربي، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله -এ তিনটির যে কোনো একটি লিখতে চাচ্ছি। অনেক দিন পূর্বে একজন পরিচিত বক্তার বয়ান শুনছিলাম, উক্ত বয়ানে তিনি বলছিলেন, এভাবে না লেখাই উত্তম।

আসলে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোন সমস্যা আছে কি? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : (ক) প্রশ্নোক্ত সূরতে কুরআন শরীফ সংশ্লিষ্ট অনুবাদ বা ব্যাখ্যা লেখতে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আপত্তি নেই। তবে কুরআন শরীফ সংশ্লিষ্ট না হলে যেমন, প্রতিদিন সবক বা বার্ষিক বন্ধের পর ইত্যাদি কলম দ্বারা চিহ্ন দেওয়া বা তারিখ লেখা মাকরূহ।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হাদীস ৮৫৩৭, ৮৫৪৭, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হাদীস ৭৯৪২, নাসবুর রায়াহ ৪/৫৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৭৪, আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ১১/২৬৪, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৪/৩৮)

(খ) নামাযের নিষিদ্ধ সময় তিনটি- এক. সূর্যোদয়ের সময়, দুই. দ্বিপ্রহরের সময়, তিন. সূর্যাস্তের সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য যেকোন সময় কাযা নামায পড়া জায়েয। সুতরাং সূবহে সাদিকের পর উমরী কাযা পড়া জায়েয।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮০, বাদায়িউস সানায়ে ২/১৫৮, ফাতাওয়া শামী ২/৬৬, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৪১, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৪১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/৩৫৭)

(গ) খানা খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া মাকরূহ। কেউ যদি এ সময় সালাম দিয়েই দেয় তাহলে সেই সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়।

তেমনিভাবে পেশাব করা অবস্থায়ও সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ। আর পেশাব করে কুলুখ নেওয়ার সময় সালাম দেওয়া অনুচিত। তবে যদি কেউ সালাম দিয়েই দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন রহ.-এর থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাআরিফুস সুনান'-এ উলামায়ে মুতাআখখিরীনের মধ্য হতে দু'জনের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

১. মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, সে সময় সালামের উত্তর দেওয়া যাবে।

২. মাওলানা মাযহার নানুতুবী রহ. বলেন, সালামের উত্তর দেওয়া জায়েয হবে না।

(আল-বাহরুর রায়িক ২/১৬, ফাতাওয়া শামী ১/৬১৬, ৬১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৭৬-৩৭৭, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩০৬, মা'আরিফুস সুনান ৩/৩১৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৯১, কিফায়াতুল মুফতী ১২/২২২)

(ঘ) যে সকল স্থানে কুরআন শরীফের কোনো আয়াত বা আল্লাহ তা'আলার নাম লিখলে তার যথাযথ সম্মান হবে না এবং তা অবহেলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা খসে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থানে কুরআন শরীফের কোনো আয়াত বা আল্লাহ তা'আলার নাম লেখা মাকরূহ।

প্রশ্নোক্ত সূরতে বাড়ির সামনের গেইটে উক্ত বাক্যগুলোর মধ্যে কোনো একটি লেখার দ্বারা তার বেহুরমতি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সেখানে লেখা মাকরূহ। তবে বাসার ভেতরে যেখানে বেহুরমতি হওয়ার আশঙ্কা নেই– বরকতের উদ্দেশ্যে কোনো আয়াতের অংশবিশেষ বা কোনো দু'আ লিখতে অসুবিধা নেই।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৮, ৫/৩৭৪, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৫৮, আল-বাহরুর রায়িক ২/৬৫, মাজমাউল আনহুর ১/১২৭, ফাতাওয়া শামী ২/২৪৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৪/৩৭)

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম গাজী
ঢাকা

৪১৫ প্রশ্ন : মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। সে ব্যবসার পাশাপাশি বিশ বছর মেয়াদে একটি জীবনবীমা করে এবং যথাসময়ে সবগুলো কিস্তি পরিশোধ করে। কিন্তু এককালীন সবগুলো টাকা উত্তোলন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ পিতার রেখে যাওয়া জীবনবীমা থেকে এককালীন টাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু এককালীন টাকা উত্তোলন করার সময় জীবনবীমার সাধারণ নিয়মানুযায়ী জমাকৃত টাকার চেয়ে কিছু টাকা বেশি দেয়। বর্তমানে মৃতের ছেলে (আব্দুল্লাহ), স্ত্রী এবং বিবাহিতা মেয়ে সকলেই যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। এখন আমার জানার বিষয় হলো, অতিরিক্ত টাকা প্রথমত তার ছেলে গ্রহণ করতে পারবে কি না? যদি সে গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে কি না? যদি তারা না পারে তাহলে তার বিবাহিতা মেয়ে বা মেয়ের স্বামী ভোগ করতে পারবে কি না? কারণ ও দলীলসহ জানালে ভালো হয়। প্রতিটি হুকুমের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের নস এবং আলাদাভাবে উসূল উল্লেখ করলে ভালো হয়।

উত্তর : ইসলাম যেহেতু সুদকে ও সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট হারাম করেছে। তাই সকল মুসলমানের জন্য পরিপূর্ণরূপে সুদ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। প্রচলিত বীমা বা ইন্সুরেন্সের ভিত্তি সুদ এবং জুয়ার উপর হওয়ায় এর থেকে প্রদত্ত আয় হারাম। এ সমস্ত বীমা বা ইন্সুরেন্সে টাকা রেখে মুনাফা অর্জন করা নাজায়েয। যদি কেউ অজ্ঞতাবশত জীবনবীমা, মেডিকেল বীমা, ব্যবসায়িক বীমা ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে সুদ গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে মূলধন ব্যতীত বীমার পক্ষ থেকে পাওয়া অতিরিক্ত টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীব-মিসকীনকে সদকা করে দিতে হবে। কোনভাবেই তা নিজে ভোগ করা যাবে না। যাকাতের অর্থ যে খাতে ব্যয় করতে হয় জীবনবীমা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত টাকা সে খাতেই ব্যয় করতে হবে।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী মৃত জয়নাল আবেদ্বীনের 'জীবনবীমা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত টাকা মৃতের ছেলে আব্দুল্লাহ), স্ত্রী এবং বিবাহিতা মেয়ে বা তার স্বামী যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে নিতে পারবে।

উল্লেখ্য, যাকাত বা সদকা দেওয়ার সময় গ্রহীতাকে একথা জানানো জরুরী নয় যে, এটা যাকাত বা সদকার টাকা।

(সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩০, সহীহ বুখারী; হাদীস ১৪১০, আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস ১/৩৯৮, বাযলুল মাজহুদ ১/৩৫৯, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ২৫৮২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৮, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৬, ৫/৯৯, ৬/৩৮৫, ৪০২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫০, ২৫১, দুরারুল হুক্কাম ১/১৮৯, মাজমাউল আনহুর ১/১৯৬, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত; পৃষ্ঠা ১৬১, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৫৮, ৩/৩৩০)

মিরাজুল ইসলাম
তিলপাপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা

৪১৬ প্রশ্ন : (ক) আমার মা আমার বাবার নিকট হতে টাকা নিয়ে ব্যাংকে তাঁর অ্যাকাউন্টে জমিয়েছিলেন। টাকার পরিমাণ ছিলো ৭৪,৪৫০/- (চুয়াত্তর হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা। তিনি সেখান থেকে আমাকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ল্যাপটপ কেনার জন্য দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর যখন লাগবে আমাকে বলিস! আর বাকি টাকা আমার নামে কেনা জমিতে বাড়ি করার জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। এখন আমার মায়ের মৃত্যুর পর ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা কি আমি একা নিয়ে অবশিষ্ট ২৪,৪৫০/- (চব্বিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা অংশীদারদের ভাগ করে দিবো, নাকি

সমুদয় অর্থ সকল ভাগিদার পাবে? যদি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আমি এককভাবে পাই তবে আমি কি সেই টাকা ল্যাপটপ কেনা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবো?

(খ) এক মায়ের তিন মেয়ে। সেই মায়ের জমি ছিলো ৫ শতাংশ আর তার সাথে আরো ৫ শতাংশ জমি তিন মেয়ের নামে ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত জমির দাম ছিলো ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। যার এক লক্ষ টাকা বড় মেয়ে ও ছোটো মেয়ে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে সমানভাবে দেন এবং ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা তাদের মা দেন। আর জমি ক্রয় করা হয় তিন বোনের নামে। এদিকে মেজো মেয়ে বড় মেয়ে ও ছোটো মেয়ের সংসারে বেশ বহুসময়কাল ভরণপোষণ করেছে। এদিকে তাদের মা নিজের ৫ শতাংশ ও পববর্তীতে ক্রয়কৃত ৫ শতাংশ মোট ১০ শতাংশ জমি তিন বোনের মধ্যে বণ্টন করে নিতে বলায় মেজো বোন ছোট বোন ও বড় বোনের সংসারে ভরণপোষণ করার কারণে ছোট বোন ও বড় বোনের উপস্থিতিতে তাদেরকে জানিয়ে ১ শতাংশ জমি বেশি নিয়েছে। বাকি ২ বোনের একজন সম্মতি দিয়েছে অন্যজন বণ্টনের সময় চুপ ছিলো; তৎক্ষণাৎ কোনো বিরোধিতা করেনি। এভাবে তারা নিজেরা বণ্টন করে নিয়েছে।

জানার বিষয় হলো, এমন জমি বণ্টনের শরঈ পদ্ধতি কী? এই বণ্টন কি শরঈ পদ্ধতিতে হয়েছে কী না? উল্লেখ্য, মা এবং তিন মেয়ে সকলেই জীবিত আছে।

উত্তর : (ক) প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে আপনার মা আপনাকে ল্যাপটপ কেনার জন্য যে টাকা দিতে চেয়েছিলেন সেটা হেবার ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর হেবার ওয়াদার ক্ষেত্রে হেবাকারীর জীবদ্দশায় হেবা-গ্রহীতা কর্তৃক সম্পদের দখল বুঝে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হেবা গ্রহীতা সম্পদের মালিক হয় না। তাই উক্ত ৭৪,৪৫০/- টাকার মালিক আপনার মায়ের মৃত্যুর সময় স্বয়ং আপনার মা নিজেই ছিলেন। সুতরাং এখন আপনাদের করণীয় হলো, পূর্ণ ৭৪,৪৫০/- টাকা আপনার মায়ের সকল ওয়ারিসের মাঝে ইসলামী ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করা। প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য কোনো ফাতওয়া বিভাগের শরণাপন্ন হয়ে সকল ওয়ারিসের তালিকা উল্লেখ করে ফারায়েয জেনে নেওয়া উচিত।

(আল-বাহরুর রায়িক ৭/২৮৪, ফাতাওয়া শামী ৫/৬৮৮, মাজমাউল আনহুর ২/৩৫৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৭৪, বাদায়িউস সানায়ে ৬/১২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৪২৬)

(খ) কেউ জীবদ্দশায় নিজের সন্তানদের মাঝে কোনো কিছু বণ্টন করতে চাইলে উত্তম হলো সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা। কাউকে কম বেশি না দেওয়া। মীরাসের হার তথা ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে দেওয়াও জায়েয আছে। তাছাড়া যদি কাউকে ঠকানোর নিয়ত ছাড়া কারোর দুরাবস্থার প্রতি খেয়াল করে কাউকে বেশি দেয় তাহলে তারও অবকাশ রয়েছে।

প্রশ্নোক্ত সূরতে যেহেতু মেয়েদের নামে ক্রয়কৃত ৫ শতাংশ জমির মধ্য থেকে ২ শতাংশ জমির মূল্য (৫০,০০০/- টাকা শতাংশ হারে) ১ লক্ষ টাকা বড় মেয়ে ও ছোট মেয়ে সমানভাবে পরিশোধ করেছে। অতএব তারা দু'জন ২ শতাংশ জমির মালিক হয়ে গেছে। মেজো মেয়ের নামে শুধু রেজিস্ট্রি করার দ্বারা সে অবশিষ্ট ৩ শতাংশের মালিক হয়নি; বরং মা যেহেতু ঐ ৩ শতাংশের মূল্য পরিশোধ করেছেন, অতএব তিনি নিজেই তার মালিক বিবেচিত হবেন। এখন মা যেহেতু ৫+৩=৮ শতাংশের মালিক তাই তার বণ্টনের আদেশ ১০ শতাংশ জমির মধ্য থেকে শুধুমাত্র ৮ শতাংশ জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; অবশিষ্ট ২ শতাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সুতরাং মেয়েদের জন্য করণীয় হলো, মায়ের ৮ শতাংশ জমি নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। আর মেজো মেয়ে, বড় ও ছোট মেয়ের সংসারে ভরণ-পোষণ বাবদ যা খরচ করেছে এটা তাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়েছে, মেজো মেয়ে তার সওয়াব পাবে। কিন্তু শুধু এর ভিত্তিতেই সে বেশি নিতে পারবে না। তবে যদি অন্য কোন শরঈ গ্রহণযোগ্য কারণ থাকে অথবা এ ব্যাপারে সকলের সম্মতি থাকে তাহলে বেশি নিতে পারবে; অন্যথায় বেশি নেওয়া ঠিক হবে না।

(সূরা নাহল; আয়াত ৯০, সহীহ বুখারী; হাদীস ২৫৮৭, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুআত্তা মুহাম্মাদ ৩/২৮১, বাদায়িউস সানায়ে ৬/১২৭, ফাতাওয়া শামী ৪/৪৪৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৯১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৪১৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/৩২১, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৪২)

আব্দুল মুকতাদির
গাজীপুর

৪১৭ প্রশ্ন : আমরা মাদরাসার শিক্ষার্থী। আমাদের মাদরাসায় প্রত্যেক জামাআত এবং বিভাগের ছাত্ররা প্রত্যেক বছর ইজতিমায়ী তথা সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের জন্য কিছু সামানা ক্রয় করে থাকে। বছর শেষে প্রত্যেক জামাআত তাদের ইজতিমায়ী সামানা বিক্রি করে খাবারের আয়োজন করে। আর কিছু সামানা এমন থাকে যা তারা পরবর্তী বছরের জন্য রেখে যায়। তাদের নিয়্যত থাকে যে, পরবর্তীতে এই জামাআতে বা বিভাগে যারা আসবে তারা ব্যবহার করবে। এ রকম রেখে যাওয়া কিছু সামানা এখন আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তাই তারা নিয়ত করেছে যে, এই সামানাগুলো বিক্রি করবে। এখন প্রশ্ন হলো, (১) পূর্ববর্তী বছরের ছাত্রদের রেখে যাওয়া সামানা ব্যবহারের সুযোগ না থাকার কারণে পরবর্তী বছরের ছাত্রদের জন্য বিক্রি করে তা দ্বারা খাবারের আয়োজন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পূর্ববর্তী বছরের ছাত্রদের রেখে যাওয়া সামানা ব্যবহারের সুযোগ না থাকার কারণে সেই সামানাগুলো বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে খাবারের আয়োজন করা বৈধ নয়। কারণ পূর্ববর্তী বছরের ছাত্ররা সামানাগুলো পরবর্তী বছরের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য রেখে যাওয়ার দ্বারা সেটা ওয়াকফ হয়ে গেছে। আর ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রি করে ভোগ করা বৈধ নয়। তবে যদি সামানাগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয় তাহলে সেগুলো বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা জামাআতের ইজতেমায়ী কাজে ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। অথবা ইজতিমায়ী কাজে ব্যবহার না করে সে টাকা সংশ্লিষ্ট মাদরাসার ফান্ডে দান করে দিবে।

(ফাতাওয়া শামী ৪/৩৪০, ৩৪৮, ৩৬৩, ৩৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩৬১, ৪৭৮, ৪৮০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৮/২০৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/৪৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২৪৫)

ইমরান হুসাইন
মালিবাগ, ঢাকা

৪১৮ প্রশ্ন : (ক) আমার কয়েকজন বন্ধু মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন অফার বিক্রয় করে থাকে। অফার বিক্রয়ের পদ্ধতি এই, সে কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে যে কোম্পানি থেকে নির্দিষ্ট হারে অফার ক্রয় করবে এবং তা নিজ থেকে সামান্য কিছু টাকা বাড়িয়ে অন্যের নিকট বিক্রি করবে। সে প্রথমে ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু টাকা বাড়িয়ে এ্যাড দেয়। তারপর কেউ তাকে সেই অফারটি পাঠাতে বললে সে কোম্পানি

থেকে নিজে প্রথমে ক্রয় করে তারপর আগ্রহীর নিকট কিছু টাকা বৃদ্ধি করে বিক্রি করে। তার এই পদ্ধতিতে অফার বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

(খ) প্রথমবার বালতিতে নাপাক কাপড় ধৌত করার পর বালতির পানি কাত করে ফেলে দেওয়ার পর আবার বালতি সোজা করলে কিছু পানি থেকে যায়। এবং বালতির যে পাশ দিয়ে পানি ফেলা হয় সে পাশে পানি লেগে থাকে। এর কারণে দ্বিতীয় বার বালতিতে পানি দিলে নাপাক হবে কী না? এরূপ তৃতীয় বার? এবং বালতি থেকে নাপাক কাপড় ধৌত করে উঠানোর সময় কাপড়ের পানি বালতির মাঝে এদিক সেদিক লেগে থাকে। এগুলোর কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার বালতিতে নেওয়া পানির কোন সমস্যা হবে কি না? নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় এবং নিংড়ানোর সময় হাতে যে পানি লাগে তা কি প্রতিবার ধৌত করতে হবে? হাতে পানি যেখানে লাগবে তাও কি প্রতিবার ধৌত করে নিতে হবে? যেমন পানির ট্যাপ ছাড়ার সময় হাত থেকে যে পানি ট্যাপ ঘুরানোর স্থানে লেগে যায় বা টিউবওয়েলের হাতলে লেগে যায়?

(গ) বিভিন্ন সময় কুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। অনেক সময় সীরাতের কুইজও হয়ে থাকে। কুইজে অংশগ্রহণকারীরা ২০/৫০ টাকা দিয়ে কুইজ-ফরম ক্রয় করে থাকে। আর পুরস্কার তিন থেকে চার জন পেয়ে থাকে। এখন জানার বিষয় হলো, এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর : (ক) উল্লিখিত সুরতে আপনার বন্ধু যদি প্রথমে নিজ টাকা দিয়ে ক্রয় করে অন্যের নিকট তা বিক্রয় করে। তাহলে এ অফার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। কোম্পানির নির্দিষ্ট রেটে বিক্রয় করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

(সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, ফাতাওয়া শামী ৫/১৩২, আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী ৩/৫৬, ফাতহুল কাদীর ৬/২৪৭, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা; পৃষ্ঠা ১১৭, ১২০, কিফায়াতুল মুফতী ১১/৩২২)

(খ) বালতিতে নাপাক কাপড় তিনবার ধৌত করার দ্বারা কাপড় যেমন পাক হয়ে যায় তেমনি ব্যবহৃত পানি সম্পূর্ণরূপে ফেলে দেওয়ার পর বালতি এবং ভেজা হাতও পবিত্র হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকবার হাত ও বালতি আলাদা করে ধোয়ার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি ভেজা হাত থেকে যে পানি ট্যাপ ঘুরানোর স্থানে কিংবা টিউবওয়েলের হাতলে লেগে যায় তা পৃথকভাবে ধোয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪২, ফাতাওয়া শামী ১/৩২৮, ৩৩৩, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/২০০, ফাতহুল কাদীর ১/১৯৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৫৩)

(গ) কুইজে অংশগ্রহণকারীরা যদি খরচমূল্যের অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে কুইজ-ফরম ক্রয় করে এবং এ ফরম বিক্রির আয় থেকেই নির্বাচিত কয়েকজন পুরস্কার পায় তবে তা সুস্পষ্ট জুয়া। সুতরাং এ জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। তবে যদি ফরম বিক্রির অর্থ ব্যবস্থাপনায় খরচ হয়ে যায়। আর পুরস্কারের ব্যবস্থা পৃথক অনুদান থেকে করা হয় তবে এ প্রতিযোগিতা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তাতে অংশগ্রহণ বৈধ হবে।

(সূরা মায়িদা; আয়াত ৯০, ফাতাওয়া শামী ৬/৪০৩, আল-বাহরুর রায়িক ৭/১৫৪, বাদায়িউস সানায়ে ৬/২০৬, কিফায়াতুল মুফতী ১১/৩১৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৩৫১, মুহাক্কাক ওয়া মুদাল্লাল জাদীদ মাসাইল ২/৪২৬)

মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

৪১৯ প্রশ্ন : নিম্নে ঈমানের কিছু আরকান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এগুলো সঠিক কি না? তাছাড়া ঈমানের আরকানের সংখ্যা ৬টি ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ১০টি (যা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে) যদি সঠিক হয় তাহলে কি তা এইগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি আরো রয়েছে?

ঈমানের ছয়টি আরকান-

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।
(২) আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।
(৩) আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা।
(৪) আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।
(৫) আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা।
(৬) ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে ১০টি কারণে ঈমান ভেঙে যায়-

(১) আল্লাহর সাথে শরীক করা।
(২) আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কোন মাধ্যম স্থির করা এবং তার কাছে সুপারিশ কামনা করা বা ভরসা করা।
(৩) কাফেরকে কাফের মনে না করা বা তাদের সম্পর্কে কাফের হওয়ার সন্দেহ পোষণ না করা বা তাদের কুফরী মতবাদকে সঠিক বলে মনে করা।
(৪) ইসলামের কোন বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।
(৫) যাদুমন্ত্র করা।
(৬) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিকদের পক্ষ নেওয়া এবং তাদের সহযোগিতা করা।
(৭) ইসলামী বিধি-বিধানের কোন বিষয়কে অপছন্দ করা।
(৮) আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় অথবা তার চেয়েও বেশি কাউকে ভালোবাসা।
(৯) ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা।
(১০) আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া।

উত্তর : এখানে মোট তিনটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে। (১) কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের আরকান। (২) কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের আহকাম। (৩) কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ। নিম্নে প্রত্যেকটি বিষয়ের উত্তর দলীলসহ দেওয়া হল-

ঈমানের আরকান

ঈমানের আরকানের শিরোনামে যে সমস্ত বিষয় প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক। তবে ঈমানের আরকানের সংখ্যা কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম ৫টি আর অনেকে ৬টি আর কেউবা ৭টিও উল্লেখ করেছেন। সবগুলোই সঠিক। যারা ৫টি উল্লেখ করেন তারা প্রশ্নে বর্ণিত ৬নং টিকে ১নং এর মধ্যে গণ্য করেন। আর যারা ৭টি উল্লেখ করেন তারা প্রশ্নে বর্ণিত ৬টি ছাড়া আরও একটি সংযোজন করেন আর তা হল মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনা। তবে যারা ঈমানের আরকানের সংখ্যা ৫টি বা ৬টি উল্লেখ করেন তারা এটাকে প্রশ্নে বর্ণিত ৫নং এর মধ্যে উল্লেখ করেন।

(সূরা বাকারা; আয়াত ১৭৭, ২৮৫, সূরা নিসা; আয়াত ১৩৬, সহীহ বুখারী ১/১৯, সহীহ মুসলিম ১/৩৭, আল-ফিকহুল আকবার; পৃষ্ঠা ৫, শরহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যা; পৃষ্ঠা ৬৮, আকীদা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ১/৩৬৯, আয়েনায়ে ঈমান; পৃষ্ঠা ১৩)

(২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মৃতিটি এখনো জীবন্ত

হাসান আব্দুল্লাহ

ভীষণ পরিশ্রম করছে সবাই। আমিও করছি। এখন সবকিছু প্রায় প্রস্তুত। অতিথিরাও চলে এসেছেন। সকলেই সাদা পোশাকে আবৃত। সাজানো চেয়ারের ঝালরগুলোও সাদা। ধবধবে সাদা। সবকিছু একাকার হয়ে ঝলমল করছে। সত্যিই সুন্দর, অপূর্ব।

আজ আমরা স্বার্থক। সীমাহীন আনন্দে আন্দোলিত। প্রত্যেকের চেহারা থেকেই আনন্দ ঝরছে। কেমন যেন একটা প্রাপ্তি, তৃপ্তিবোধ এবং সার্থকতার ছোঁয়া- সময়ের বিদগ্ধ আলেমগণ আজ আমাদের অতিথি। সত্যিই সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য আমাদের।

অতিথিগণ একে একে আসন গ্রহণ করেন। আমরা সাধ্যমত সহযোগিতা করি। সবশেষে সভাপতির আগমন। তার প্রভাব এবং আভিজাত্যে সেমিনার হলে ভিন্ন এক আবহ তৈয়ার হলো।

পুরো সেমিনার নিরব, অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। তিনিও আসন গ্রহণ করেন। এক পাশে দেশসেরা মুফতী যামানার অন্যতম প্রাজ্ঞ আলেমে দ্বীন, আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক। অপর পাশে অনন্য ব্যক্তিত্ব, যুগের সমুজ্জ্বল তারকা আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী। দু'জনই তার অন্যতম শিষ্য, আস্থাভাজন ও নির্মোহ নির্ভিক আলেমে দ্বীন। উপস্থিত সকলেই তার ইলমী সুধায় আপ্লুত।

সময়ের সবচেয়ে দামি মানুষ তিনি। দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় শাইখ আল্লামা আজিজুল হক। যার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত ইলমী জগৎ। যুগ যুগ ধরে জাতি যার জ্ঞান অবিরত আহরণ করছে।

তিনি এ সেমিনারে উপস্থিত আলেমগণের করণীয় বলবেন। দীর্ঘ পর্যালোচনায় তুলে ধরবেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

এখন স্বেচ্ছাসেবকদল অপ্রাসঙ্গিক। যেখানে আমরা প্রায় সকলেই ছোট। উচ্চ মাধ্যমিকের তালিবে ইলম মাত্র। এতো বড় সেমিনারে আমাদের উপস্থিতি একেবারেই অশোভন। অবশ্য তেমন একটা প্রয়োজনও নেই। তাই চুপিসারে হল ত্যাগ করছি।

কিভাবে যেন এক সাথী শাইখের সঙ্গে মুসাফাহার সুযোগ পেয়ে যায়। সাথে সাথে আমরাও এগিয়ে যাই। সবশেষে আমার পালা। আমিও হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করি। যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তার হাতে আমার মতো ক্ষুদে তালিবে ইলমের হাত। এ এক অপার্থিব অনুভূতি। অন্যরকম ভালোলাগা। ভাবতেই কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠি। মুহূর্তটি আমার জীবনের পরম এক মুহূর্ত।

শাইখ আমার হাত ধরে আছেন আর আমি অনুচ্চ কণ্ঠে দু'আ পড়ছি। শাইখ আমাকে নাম জিজ্ঞেস করেন। আমি মৃদু আন্দোলিত হয়ে উঠি। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আমার নামটি বলি। শুনে ফের তিনি আমার নামটি উচ্চারণ করেন। জী– বলে সমর্থন জানাই। হাত ধরে রেখেই তিনি বলেন, 'বেশি বেশি দুরূদ পড়বে'। কথাটি শোনামাত্র ঘুম ভেঙে গেল।

জেগে দেখি চারপাশ সেই আগের মতোই। সাথীরা দুপুরে সবক শেষে তাকরার করছে। কেউ কেউ আমার দিকে কেমন তাকিয়ে আছে। আর আমি ছোট্ট তেপায়ার উপর মাথা রেখে অবাক চোখে দেখছি। মাথাটা ঝিম ধরে আছে। অলস বসে বিছানাহীন ঘুমালে যা হয়। তবে স্বপ্নের আবেশ এখনো শেষ হয়নি। শাইখের মোলায়েম হাতের স্পর্শ অনুভব করছি। বারবার হাতটি নেড়েচেড়ে দেখছি আর স্বপ্নটি মনে রাখার চেষ্টা করছি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আসরের এখনো বাকি। মনমরা হয়ে বসে আছি। সাথীরা যার যার মতো রুমে তাকরার করছে। আমার কেন যেন মনটা ভালো নেই। তাই কুরআন নিয়ে তিলাওয়াত করছি। প্রায়ই মন ভালোর জন্য কুরআন পড়ি। আজো তেমনি পড়তে বসি। কখন যে তেপায়ার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে যাই নিশ্চিত বলতে পারবো না। হঠাৎ এ স্বপ্ন আমাকে অবাক করে তোলে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।

কী করবো বুঝতে পারছি না। আসর শেষে ছুটে যাই শাইখের কাছে। তখন তিনি বেলা শেষে রাহমানিয়ার দোতলায় বসেন। এখন যেখানে পত্রিকা অফিস ঠিক তার পেছনের বারান্দায়। সুযোগটি আমিও হাতছাড়া করিনি।

প্রতিদিনের ন্যায় আজো বসেছেন। একজন খাদেম শরীর ম্যাসেজ করছে। কয়েকটি বাচ্চা চারদিক ঘিরে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। কেউ বা দূর থেকেই এক পলক দেখে নিরবে সরে পড়ছে।

আমি কিছুটা কম্পিত পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সালাম শেষে মুসাফাহা করি। সুযোগ বুঝে পরিচয়টাও তুলে ধরি। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে সব শুনেন। সাহস পেয়ে স্বপ্নটির কথাও বলি।

তখন তিনি স্বাভাবিক অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন 'তোমাকে বেশি বেশি দুরূদ পড়তে বলেছি! হ্যাঁ, আমিও বেশি বেশি দুরূদ পড়ি'। তারপর তিনি নিরব হয়ে যান। একেবারে নিরব। আর কিছুই বলেননি। চাহনিতে একটা উদাস উদাস ভাব। কিছুটা হাহাকার। আমি ক্ষাণিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। আর কিছুই বলতে পারিনি। তারপর একেবারেই ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে একটি সালাম দিয়ে বেরিয়ে আসি।

তখন থেকে আজ ষোল বছর পেরিয়ে গেল। স্মৃতিটি এখনো জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত। বহমান জীবনের অংশ হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

লেখক : তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

দ্বি-মাসিক

রাবেতায়

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল : rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫